

প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ ১৩৬২

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—
শ্রীনরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী
স্বপ্না প্রেস লিমিটেড্
৮।১, লালবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা—১

প্রচ্ছদপট-শিল্পী
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

মা ও বাবা-কে

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

॥ অন্যান্য বই ॥

নতুন নায়িকা
রাম রহিম
আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য

॥ অনুবাদ ॥

প্রিয়তমেষু
শাদা কালো
দুই ভাই
সেতুবন্ধ
রাজসূয়
অন্তর্জ্বালা
গোধূলির গান

অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার ব্যারন ফ্রেডরিক মাইকেল ভন জি উনিশ শো চোদ্দ সালের শরতে রাওয়ারুস্কার যুদ্ধে মারা যান। তাঁর বাড়িতে তাঁর দেরাজের কাগজপত্রের মধ্যে একটি সীল-করা প্যাকেটে নিম্নোদ্ধৃত কাহিনীটি পাওয়া গিয়েছিল। নাম দেখে আর লেখাটার উপর বারেক চোখ বুলিয়ে মৃতের আত্মীয়স্বজন ভাবলেন —উপন্যাস-রচনার এ একটা প্রাথমিক প্রয়াস মাত্র। পড়ে দেখবার জন্যে তখন ওটা তাঁরা আমাকে দেন। এবং, উপযুক্ত মনে করলে লেখাটি প্রকাশের অধিকারও সেই সঙ্গে আমাকে দেওয়া হয়।

আমার নিজের কিন্তু বিশ্বাস, উপন্যাসের নামগন্ধও এতে নেই, নিছক বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণী এটা। সেই হিসেবেই লেখাটি আমি প্রকাশ করছি। কোথাও কোনওরকম কাটছাঁট করিনি, তবে লেখকের পরিচয়টা গোপন রাখলাম।

আজ হঠাৎ মনে হল, সেই আশ্চর্য রাতের অভিজ্ঞতাটা আমার লিখে রাখা উচিত। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঘটনা যাতে স্বাভাবিক ভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখতে পারি, লেখা দরকার তারই জন্যে। এই লেখার ইচ্ছেটা আমায় যেন একেবারে পেয়ে বসেছে। সে-রাতের বিচিত্র সেই অভিজ্ঞতা

লিখে ফেলবার দুর্বার একটা তাগিদ বোধ করছি। কিন্তু, সত্যিই আমি কি পারব ঘটনাবলীর সেই রহস্যময়তাকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে? নিজের মনেই আমার তা নিয়ে গভীর সন্দেহ। কেননা শিল্পীজনোচিত প্রতিভা, লেখার অভ্যেস আমার নেই। কোন্ ছেলেবেলায় ইশকুলে পড়বার সময় দু-একটা ব্যঙ্গরচনা লিখেছিলাম—লেখক হিসেবে দৌড় আমার ঐ পর্যন্ত। এমন-কি এ-ব্যাপারে বিশেষ কোন টেকনিক রয়েছে কিনা, তাও জানিনে। বাইরের ঘটনাবলী সহজ ভাষায় গুছিয়ে লিখে যাওয়া আর মনের উপর তার প্রতিক্রিয়ার ছবিটি হুবহু তুলে ধরাই কি হবু লেখকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব? জানা নেই! অধিকন্তু, যেটাকে সার্থক কথাশিল্পীর রচনাশৈলীর অনন্য বৈশিষ্ট্য বলে সবসময় আমার মনে হয়েছে—শব্দপ্রয়োগের সেই চাতুর্য, অর্থ ও সুরসঙ্গতি বজায় রেখে ঠিক জায়গায় ঠিক শব্দটি বসানোর ক্ষমতা—তাও কি আমার আছে? কে জানে!

যা হোক, আমি লিখছি শুধু আমারই জন্যে। যে-রহস্যের হদিশ নিজেই পাইনি, পরকে তা বোঝাব কি করে? আমি কেবল এর একটা হিসেব-নিকেশ করে ফেলতে চাই। নিজে এর সঙ্গে কিছুটা জড়িয়ে পড়েছিলাম, তার ফলে অনেকখানি বিচলিতও হয়ে উঠেছিলাম সত্যি, তবে এখন আমি যতদূর সম্ভব নৈর্ব্যক্তিক ভাবেই সব-কিছু বিচার করে দেখব।

কোন বন্ধুকে এতদিন এ-কাহিনী বলিনি। প্রথমত, এর প্রকৃত তাৎপর্য কাউকে বোঝাতে পারব কিনা, সন্দেহ ছিল। দ্বিতীয়ত, লজ্জা। নেহাৎ-ই আকস্মিক একটা ব্যাপারে আমি কিনা এতখানি অভিভূত হয়ে পড়েছি? আসলে

সমগ্র ব্যাপারটা অতি সামান্য নগন্য একটা·········এই দেখুন আনাড়ী লেখকের কী দুরবস্থা! এই কথাগুলি লিখতে গিয়েই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি, ঠিক মতন শব্দটা খুঁজে পাচ্ছিনে। সহজ সরল শব্দাবলীর মধ্যেও যে কতখানি দুর্বোধ্যতা লুকিয়ে থাকে! ঘটনাটাকে আমি 'সামান্য' 'নগণ্য' বলে বিশেষিত করলাম। এটা করলাম, বলাই বাহুল্য, তুলনামূলক বিচারে। পৃথিবীতে নাটকীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ভূরি ভূরি ঘটে থাকে, এক-একটা জাতির ভাগ্যই তাতে বদলে যায়--সে-তুলনায় এটা সামান্য ও নগণ্য বইকি। তাছাড়া, ঘটনার স্থায়িত্বের কথাটাও আমি ভেবে দেখেছি। যে-রোমাঞ্চকর কাহিনীটির বিবরণ আপনাদের এখন দেব তার মেয়াদ মাত্র ছ ঘণ্টা।

অবিশ্যি, নিরাসক্ত চোখে সাধারণভাবে দেখলে এটাকে যত অনুল্লেখ্য, অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে হোক—ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে মূল্য এর অপরিসীম। আজও, সেই আশ্চর্য রাতের পর দীর্ঘ চার-চারটি মাস কেটে যাওয়া সত্ত্বেও, সবকিছু জ্বলজ্বল করছে চোখের সামনে। আজও তার জ্বালায় আমি জ্বলছি। তাই কাহিনীটা সকলকে জানিয়ে দেবার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছি। প্রতিদিন, দিনের প্রতিটি মুহূর্তে ওই ঘটনার রোমন্থন করেছি; অতি খুঁটিনাটি, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিবরণগুলি পর্যন্ত মনে মনে ভেবে দেখেছি। বারবার। এ ছাড়া আমার উপায় ছিল না—সেই রাতটিই যে আমার সমগ্র অস্তিত্বের কেন্দ্র-বিন্দুতে পরিণত। রহস্যময় ওই রাতকে ঘিরেই অবিরাম আবর্তন আমার। আমার প্রত্যেকটি কথা ও কাজকে নিয়ন্ত্রিত করছে ওই আশ্চর্য রাত, করছে আমার অজান্তে। আর কিছু

আমি ভাবিনে, ভাবতে পারিনে। সবসময় মনে ওই এক চিন্তা। পাছে ভুলে যাই, পাছে কোন ভুল হয়ে যায়—দিনরাত সেই রাতটির কথা ভেবেছি আমি। ভাবছি এখনো। ভাবছি, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেই অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতাটা মনে যাতে গাঁথা হয়ে থাকে, তাই। ফের যাতে সেটা বাস্তব হয়ে ধরা দেয়, প্রত্যক্ষগোচর সত্য হয়ে ওঠে, পুনরুক্তির ফলে সে-রাতের সেই তীব্র আবেগানুভূতির শিহরণ যাতে পুনরায় জাগে মনে ও মস্তিষ্কে—তাই আমি কলম নিয়ে বসেছি। দশমিনিট আগেও এটা বুঝিনি। এখন বুঝছি। অতএব অভিজ্ঞতাগুলো লিখে ফেলে এর একটা হিসেব-নিকেশ আমি করে ফেলতে চাই—এ-কথা বলা আমার ভুল হয়ে গিয়েছে।

তাহলে, কী চাই আমি? চাই ঃ ক্ষণস্থায়ী সেই ঘটনাবলীর চিত্র আরো জীবন্ত হয়ে, চিরন্তন রূপ নিয়ে চোখে আমার ধরা দিক। তার প্রাণময় উষ্ণ সান্নিধ্য আমি কামনা করি। আজীবন ওটা বাস্তব হয়ে বিরাজ করুক আমার কাছে। না না, বিষণ্ণ সেই অপরাহ্ণ আর আশ্চর্য সেই রাতের কথা ভুলে যাব—এমন আশঙ্কা মুহূর্তের তরেও মনে জাগছে না। ওই ক'ঘণ্টার স্মৃতিকে মনের পটে ধরে রাখতে আর-কোন স্মারকের, নতুন-কোন প্রেরণার প্রয়োজন আমার নেই। নিশিতে-পাওয়া লোকের মত সেই অপরাহ্ণ, আর সেই রাতের স্মৃতিগুলি আমি রোমন্থন করি, দিনরাত—মুখস্থ-করা পার্টের মত। নেহাৎ নগণ্য অনেক কিছুই স্পষ্ট মনে রয়েছে—বুদ্ধি দিয়ে যার মানে বোঝা যায় না, হৃদয় শুধু তার মর্ম বোঝে। এখনো, এই শরতেও, বসন্তসবুজ সেই প্রান্তরের প্রতিটি পত্রপল্লবের নিখুঁত একটি রেখাচিত্র আমি কাগজের

উপর ফুটিয়ে তুলতে পারি। সেই ফুটন্ত চেস্টনাটের সমারোহ এখনো চোখে ভাসছে। মনে হয়, মৃদুমধুর পুষ্পসুরভির আঘ্রাণ পাচ্ছি এখনো। এই কাহিনী লেখার মধ্য দিয়ে আমি হারানো অতীতের রোমন্থন করছি সত্যি, কিন্তু পাছে ভুলে যাই সেই আশঙ্কায় নয়। এ-রোমন্থনে আছে নিছক আনন্দের রোমাঞ্চ।

আর একটা কথা, ঘটনাগুলি অবিকল লিখে যাওয়ার সময় নিজের ওপর পুরোপুরি কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হবে। কেননা, দেখেছি তো, ওকথা মনে হলেই কেমন-একটা উন্মাদনা আমায় পেয়ে বসে, ভাবাবেগে আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি—সবকিছু একাকার হয়ে যায়। আজ কিন্তু তা হলে চলবেনা।

…সাল উনিশ শো তেরো, আটই জুন। আমি একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করলাম।…ভাবতেই বুকটা ছলাৎ করে ওঠে। এ কী যা-তা লিখছি!

আজ প্রথম, সে-রাতের সেই অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক বিবরণী লিখতে গিয়ে এই প্রথম বুঝছি, যে-অনন্ত প্রবাহকে আমরা জীবন বলি তার রূপায়ণ কত দুষ্কর! আমি লিখলাম, 'আমি' এই-এই করেছিলাম—উনিশ শো তেরো সালের আটই জুন 'আমি' একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করলাম। কিন্তু, আসলে ওই সর্বনামটাই যে একেবারে অর্থহীন। কেননা, সেই আটই জুনের 'আমি' আর আজকের এই 'আমি' তো এক নই। মাত্র মাসচারেকের কথা যদিও, তবু এরই মধ্যে ঘটে গিয়েছে আমূল পরিবর্তন। আজও আমি সেদিনের সেই 'আমি'র বাসায় বাস করছি, তারই টেবিলের সামনে এখন বসে রয়েছি, তারই কলম আমার হাতে ধরা—তবু সে-'আমি' আর এ-'আমি'তে কত না তফাৎ! সেদিনের সেই

'আমি'র থেকে নিজেকে 'আমি' আলাদা করে ফেলেছি অনেক আগেই। সবচেয়ে বড় কথা— যে-'আমি'র অভিজ্ঞতার বিবরণ আমি দিতে চাইছি—সে-'আমি' আর এ-'আমি' সম্পূর্ণ আলাদা। বাইরে থেকে তাকে আমি দেখি, দেখি নিরাসক্ত দৃষ্টিতে, অনাত্মীয় চোখে। অতিপরিচিত বন্ধু বা অন্তরঙ্গ সাথীর মত সেই-'আমি'র অবিকল বর্ণনা আমি দিয়ে যেতে পারি। পারি, তার মনের-প্রাণের অনেক গোপন খবর আমি জানি বলে—কিন্তু, তবু, এই-'আমি' আর সেই-'আমি' তো আসলে এক নই—দুজনে আলাদা দুটি মানুষ। অনর্গল তার কথা আমি বলে যেতে পারি, মুক্ত-মনে তার নিন্দা কি প্রশংসা করে যেতে পারি—মুহূর্তের জন্যেও মনে হবে না যার কথা বলছি, যার নিন্দা বা প্রশংসা করছি—সে আমারই আরেক রূপ, সে-আমি অতীতের আমি!

চালচলন আচারআচরণের দিক দিয়ে সেদিনের সেই-'আমি'র সঙ্গে তার শ্রেণীর অন্যান্যদের বড়-একটা তফাৎ ছিল না। কোন-রকম দাম্ভিকতার বশবর্তী হয়ে নয়, অতি সহজ ভাবেই নিজেদের তারা 'অভিজাত শ্রেণী'র মানুষ বলে ভাবত। বয়েস তখন আমার পঁয়ত্রিশ। আমি সাবালক হয়ে ওঠার কিছু আগেই আমার মা-বাবা মারা যান। বেশ-কিছু তাঁরা আমার জন্যে রেখে গিয়েছিলেন। তাই কোন্ পথে জীবিকা নির্বাহ করব, কি করে নিজের পায়ে দাঁড়াব—এ-প্রশ্ন আদৌ ওঠেনি। বরং তাঁরা বেঁচে থাকতে ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার মনে ভয়ানক একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ভবিষ্যতে কি করব কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। তাঁদের মৃত্যুতে তার সমাধান হয়ে গেল।

সবে তখন ইউনিভারসিটির পাট চুকিয়েছি, বেশ বুঝছি কিছু-একটা এবার শুরু করা দরকার—কিন্তু কী করব ভেবে পাচ্ছিনে। আমার আর-আর আত্মীয়স্বজনের দিকে তাকিয়ে, এবং শান্ত নিরুপদ্রব জীবনের প্রতি আমার সহজাত আকর্ষণের কথা মনে করে স্বভাবতই সকলে ভাবলেন—বড়-সড় গোছের একটা সরকারী চাকরি আমি বেছে নেব।

কিন্তু পৈত্রিক সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে আমি দেখলাম, চাকরি না করেও স্বাধীনভাবে বাঁচতে, খুশিমত সব সাধ মেটাতে আমি পারি। উচ্চাশার অস্বস্তি কোনদিন ভোগ করিনি, ভবিষ্যতে কেউ-কেটা হবার স্বপ্নও কখনো দেখিনি। তাই ঠিক করলাম—আপাতত বছরকয়েক জীবন-টাকে দেখে বেড়ানো যাক, পরের কথা পরে। তেমন লোভনীয় কোন পেশার সন্ধান যদি পাই, ভেবে দেখবখন সময়মত।

জীবনে আমার বড় কোন প্রত্যাশা ছিলনা, অতএব কোন সাধই অপূর্ণ রইল না। জীবন দেখে বেড়াতে লাগলাম। এই জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট রইলাম। সত্যি, ভিয়েনার মত চমৎকার শহর হয় না। আরামবিলাসের এমন অঢেল উপকরণ অন্য কোথাও নেই। এর নয়নমনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর শিল্পসম্ভারের রসের সায়রে একবার ডুব দিলে, জগৎ-সংসার হারিয়ে যায়! গা ভাসিয়ে দিলাম ভিয়েনার অলস-মন্থর জীবনস্রোতে। কায়িক শ্রমের কথা ভুলেও মনে এল না। আমার মত অবস্থাপন্ন, সুদর্শন, উচ্চাশাহীন অভিজাত তরুণের সামনে জীবন-উপভোগের যত রকম উপায় ছিল সবগুলিই গ্রহণ করলাম ঃ ছোটখাট জুয়োখেলার নির্দোষ উত্তেজনা, নানা

ধরনের খেলাধুলো, খুশিমত ভ্রমণ ইত্যাদ ইত্যাদি। তারই মধ্যে আবার ধীরে ধীরে গড়ে তুললাম নিজস্ব একটি শিল্পরুচি—দুষ্প্রাপ্য আয়না সংগ্রহে মন দিলাম। দুষ্প্রাপ্য জিনিস সংগ্রহের বাতিক অবিশ্যি আমার আগে ছিল না। কিন্তু এখন দেখলাম, এই সংকীর্ণ ক্ষেত্রে অনায়াসেই আমি সংগ্রাহক হিসেবে নাম করতে পারব। রোকোকো শৈলীতে আঁকা ইতালীয় ছবি আর কানালেত্তো স্কুলের নিসর্গ চিত্র দিয়ে ঘর সাজালাম। কখনো এসব কিনতাম দোকান থেকে, কখনও-বা নীলামে। নীলামে ডাক দেওয়া ছিল আমার এক ধরনের বিলাসিতা—ধাপে ধাপে দর চড়ত, আর রীতিমত একটা উত্তেজনা বোধ করতাম আমি। প্রত্যেকটি জলসায় উপস্থিত থাকা আমার ধরাবাঁধা নিয়ম হয়ে দাঁড়াল। প্রায়ই যেতাম নামকরা সব শিল্পীদের স্টুডিওতে। জীবনকে সর্বতোভাবে উপভোগ করতে চাই, মেয়েদেরও তাই বাতিল করলাম না। এ-ব্যাপারে আমার সংগ্রাহক মনের নেপথ্য তাগিদে (নিরবলম্ব জীবনের থেকেই জন্ম এ-তাগিদের) অনেক স্মরণীয় মুহূর্ত কাটালাম বহু রমণীর রমণীয় সাহচর্যে। ধীরে ধীরে এ-ব্যাপারেও হয়ে উঠলাম পাকা জহুরী।

এক কথায়, অনায়াস এই জীবনের স্রোতে নিজেকে আমি সঁপে দিলাম। সময় যে কোথা দিয়ে কি ভাবে কেটে যায় টেরও পাইনে। এ-জীবনে আকর্ষণ আছে, উত্তেজনা নেই। গতানুগতিক এই জীবন, নাতিশীতোষ্ণ পরিবেশ এর—তবু একেই আমি ভালোবাসলাম, একেই গ্রহণ করলাম একান্ত করে। কখনো বড়-রকম কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা মনে জাগেনা, জাগলেও সাড়া তোলে না। বরং নিস্তরঙ্গ এই জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ

ঘটনাগুলিই আমার কাছে অগাধ আনন্দের খনি। মনোমত একটি নেকটাই কি সুখপাঠ্য একটা বই কিনতে পারলে, বা ঘণ্টাখানেক কোন মেয়ের সঙ্গে কাটাবার সুযোগ পেলেই খুশীতে হৃদয় ভরে যেত। মনে হত, আমার জীবনটা যেন ইংরেজ দর্জীর তৈরী সুন্দর একটি স্যুট—কোথাও খুঁত নেই এতটুকু। উপমাটা ভেবে কী তৃপ্তিই যে পেতাম সেদিন!

মনে হয় বন্ধুরাও আমায় পছন্দ করত, খুশী হত আমার সান্নিধ্যে। পরিচিত সকলেরই ধারণা ছিল আমি বড় সৌভাগ্যবান।

কিন্তু, যে-অতীত মানুষটির কথা আমি লিখছি, সেও কি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে ভাবত? ঠিক মনে পড়ে না। সে রাতের সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার পর থেকে মনের মধ্যে সব কিছু আমার ওলটপালট হয়ে গিয়েছে। যতবেশি ভাবি, সেই আশ্চর্য রাতের ছবিটাই তত স্পষ্টতর হয়ে ওঠে, আগেকার সবকিছু আসে ঝাপসা হয়ে।

তবে এটা সত্যি যে সেদিনও আমি অসুখী ছিলাম না। কেন হব অসুখী? আমার কোন ইচ্ছেই তো অপূর্ণ থাকত না। জীবনে আমার কোন ব্যর্থতা ছিল না। যা চেয়েছি, পেয়েছি। আর, এরই ফলে, যা চেয়েছি তাই পেয়েছি ব'লেই, ভাগ্যের বিরুদ্ধে কখনও নালিশ জানাতে হয়নি। তাই আমার কেমন ধারণা হয়ে গিয়েছিল, মানুষের জীবন নেহাৎ গতানুগতিক একটা ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়। কাজ করে যাই—কি করছি জানিনে, কেন করছি কে জানে! সত্যিকারের ইচ্ছে বলে কিছু নেই—কিছু ইচ্ছে করতে হয় বলেই ইচ্ছে করি, ইচ্ছের খাতিরেই জন্ম এই ইচ্ছের। এই ইচ্ছের তাগিদ জোরালো

হোক, কিন্তু আমি যেন তাতে অধীর না হয়ে পড়ি, আমি যেন আত্মকর্তৃত্ব হারিয়ে না ফেলি। এর পেছনে অশেষ উচ্চাশা থাকুক, কিন্তু ব্যর্থকাম যেন আমি কখনো না হই। আবার, পরিপূর্ণ ভাবে জীবন উপভোগের কামনা যেমন প্রবল, তেমনি জীবনের হাতে যন্ত্রনা সইবার জোরালো বাসনাও রয়েছে হয়ত। কে জানে!

অত্যন্ত সুকৌশলে ও সচেতন ভাবে জীবনের পথকে আমি নিষ্কণ্টক করে তুলেছিলাম। কখনও কোন বাধাবিপত্তির মুখোমুখি না হওয়ায় আমার প্রাণশক্তিও ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে এল। কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়তে লাগলাম। লক্ষ্য করলাম, আর আমার মনে আগেকার মত বাসনার জোয়ার জাগে না। ক্বচিৎ-কখনো জাগলেও, সেটা পূরণের তেমন তাগিদ আর মনে করিনে। আমার চেতনা একটু একটু করে অসাড় হয়ে যাচ্ছে। এক ধরনের আত্মিক ক্লীবতায় (তা ছাড়া কী বলব একে?) আমি মুহ্যমান হয়ে পড়ছি। বাসনাব্যাকুল দু বাহু দিয়ে জীবনকে আর আঁকড়ে ধরতে পারিনে। জীবনের প্রতি কোনও মোহ আর নেই আমার।

কি ভাবে প্রথম এই ধারণাটা মনে এল, ছোটখাট কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। হয়ত শুনলাম, কোন বিখ্যাত নাটকের অভিনয় হচ্ছে, অথচ কী আশ্চর্য—দেখতে যাবার উৎসাহ একেবারে পাচ্ছিনে! বহু-আলোচিত বইগুলি যথারীতি কিনি। কিন্তু ঐ পর্যন্ত, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যায়, ছুঁয়েও দেখিনে। আগের মতই আয়না আর ছবি সংগ্রহ করে চলেছি বটে, চলেছি নীরস কর্তব্যের প্রেরণায়। অনেক খুঁজেপেতে একটা জিনিস সংগ্রহ করতে পারলে যে-আনন্দ হওয়া উচিত, তার এক কণাও আর

জাগেনা আমার মধ্যে। সংগ্রহ করে ফেলে রাখি যেখানে-সেখানে, সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখবার কথা ভুলেও মনে হয় না।

প্রথম যেদিন আমার এই মানসিক পরিবর্তনের, এই মনোবৈকল্যের কথা টের পেলাম—আজও মনে পড়ে—স্পষ্ট। গ্রীষ্মকাল। কোথায় বেড়াতে যাব, কেনই বা যাব, আর গিয়েই বা কী লাভ ইত্যাদি ভেবে ভিয়েনাতেই সেবার থেকে গেলাম। এই সময় হঠাৎ একদিন একটি মেয়ের কাছ থেকে একটা চিঠি এল। মেয়েটি আমার পরিচিত, বছর তিনেক অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে আমরা কাটিয়েছি। এবং, আমার সত্যিই ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে মেয়েটির প্রেমে আমি মশগুল।

চোদ্দ পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ চিঠি—ভাষার কত কারিকুরি, কী উচ্ছ্বাস! মেয়েটি জানিয়েছে যে সম্প্রতি একজনের সঙ্গে তার ভাব হয়েছে। শুধু ভাব নয়, অধুনা সে-ই তার প্রাণেশ্বরে পরিণত। আগামী শরতে তাকে সে বিয়ে করতে চায়। অতএব, আমার সঙ্গে তার সম্পর্কের এবার ইতি হোক। অবিশ্যি আমাদের দুজনের সেই আনন্দমদির দিনগুলির কথা ভেবে অতীতের জন্যে মনে তার কোন আপসোস নেই—সেই সুখ-স্মৃতি চিরকাল তার মনে অম্লান থাকবে। আমার কথা সে ভুলবে না—তার নতুন জীবনেও যৌবনের মধুরতম স্মৃতি বয়ে আমি বিরাজ করব। এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের জন্যে আমি যেন তাকে ক্ষমা করি—এই তার একান্ত প্রার্থনা। যথাবিহিত ভূমিকা অন্তে মাথার দিব্যি দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছে—তার সম্পর্কে খারাপ কিছু যেন না ভাবি, তাকে হারিয়ে যেন দুঃখে ভেঙে না পড়ি। তাকে ফিরে পাবার চেষ্টা করা যেমন আমার পক্ষে ঠিক হবে

না, তেমনি তাকে পেলাম না বলে হুট করে কিছু করে বসাও হবে যারপরনাই অনুচিত। আমি যেন দেখে-শুনে আর কাউকে ভালোবাসি। আমার মত স্বামী পেলে বলে কত মেয়ে ব'লে বর্তে যাবে! তাদের কাউকে নিয়ে যেন আমি সুখী হই। আর এই চিঠি পাওয়া মাত্র যেন জবাব দি। আমার চিঠির আশায় সে পথ চেয়ে থাকবে। পেন্সিলে পুনশ্চ ঃ ঝোঁকের মাথায় কিছু করে বসো না, লক্ষ্মিটি! আমায় ভুল বুঝো না, আমায় ক্ষমা করো।

প্রথমবার চিঠি পড়ে আমি শুধু অবাক হলাম। শুধুই অবাক! দ্বিতীয়বার পড়তে পড়তে কেমন-একটা লজ্জার অনুভূতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তারপর লজ্জার আসল মানেটা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে জাগল আতঙ্ক। আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়লাম। এ কী! প্রেমিকার কাছ থেকে এ ধরনের চিঠি পেলে মানুষের মনে স্বভাবতই যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তার লেশমাত্রও আমি অনুভব করছিনে কেন? কেন! স্বাভাবিক কারণেই মেয়েটি আশঙ্কা করেছে—চিঠি পড়ে না জানি আমি কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড করে বসব—কিন্তু ভয়ঙ্কর কোন কাণ্ড দূরের কথা সামান্য কিছু করার মত উৎসাহও যে আমার জাগছে না। কই, বুকটা তো মোচড় দিয়ে উঠছে না? হৃদয়টা তো বারেকের তরেও টনটনিয়ে উঠল না? ওর ওপর রাগ, ঘৃণা বিদ্বেষ, আক্রোষ কিছুই জাগছে না—ওর বা নিজের কোন রকম ক্ষতি করবার চিন্তা মনেও আসছে না।

মনের এই নিরাসক্তি এমনই একটা মারাত্মক ব্যাপার যে, নিজের কথা ভেবে আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। বহু বছরের

অন্তরঙ্গ একটি মেয়েকে চিরদিনের মত হারাচ্ছি—তবু মন একবার হাহাকার করে উঠবে না! একদিন যার উষ্ণকোমল দেহটি বুকে নিয়ে স্বর্গসুখ অনুভব করেছি, রাত্রির নির্জনে আমার পাশটিতে যার ঘুমন্ত শ্বাসপ্রশ্বাসের ছন্দ শুনেছি তন্ময় হয়ে— আজ সে একেবারে পর হয়ে যাচ্ছে, জন্মের মত দূরে সরে যাচ্ছে—কই, তবু তো ব্যথায় বুকখানা গুঁড়িয়ে যাচ্ছে না! এমন একটা চিঠি পড়েও কোন ভাবান্তর জাগছে না! এই বিয়ে ভেঙে দেবার, নিজের হারানো মর্যাদাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবার, একটুও তাগিদ বোধ করছিনে—কেন? সমর্থ-জোয়ান এক পুরুষের কাছ থেকে স্বভাবতই যে প্রতিক্রিয়া মেয়েটি আশা করেছে তার নামমাত্রও দেখা দেয়নি আমার মধ্যে—কেন?

মন যে আমার কতখানি ক্লীবতায় আচ্ছন্ন, এই ঘটনার মধ্যে দিয়েই সেটা প্রথম বুঝতে পারি। কী বলব একে? শুধুই মানসিক ক্লীবতা? নাকি, স্রোতে-ভেসে-যাওয়া হালভাঙা-পাল-ছেঁড়া নৌকোর সাথে তুলনীয় এই আমার জীবন? বেশ বুঝছি, এই নিরাসক্তি মৃত্যুর শামিল। এই জীবন্ত শরীরে এক শবের বোঝা যেন আমি বয়ে বেড়াচ্ছি। শবের পূতিগন্ধে জীবন আজো অসহ হয়ে ওঠেনি সত্যি, কিন্তু অনিবার্য এই জীবনের অবক্ষয়। এই নিশ্চেতন জীবন সম্পর্কে কোন আশা, কোনও আশ্বাস আর নেই। এই সাময়িক অবসাদ দৈহিক মৃত্যুর ভূমিকা। মৃত্যু—চিহ্নহীন অবলোপ।

রোগী যে ভাবে তার রোগের গতি পর্যবেক্ষণ করে চলে, এবার থেকে আমিও তেমনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলাম আমার এই মানসিক ক্লীবতার দিকে। দিনকয়েক পরে আমার এক বন্ধু

মারা গেল। ছেলেবেলার প্রাণের বন্ধু—চিরকালের মত হারালাম তাকে। কিন্তু, তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একটা প্রশ্ন মনে জেগে উঠল: আচ্ছা, বন্ধুর মৃত্যুতে সত্যিই কি আমি দুঃখিত? সত্যিই দুঃখিত? কই, একবারো তো তেমন মনে হচ্ছে না। একবারো তো বুকটা খাঁ খাঁ করে উঠছে না। তবে কি আমি এক দর্পণ মাত্র। সবকিছুরই প্রতিবিম্ব সেখানে পড়ে, কিন্তু স্থায়ী হয় না কিছুই—কোন দাগই রেখে যায় না? তাই কি?

এই ধরনের ঘটনাগুলি যত গভীর ভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করিনে কেন, মনে কোনও বিকার দেখা দেয় না। এজন্যে আমার দুঃখিত হওয়া উচিত বুঝি, মন তবু আমার অবুঝ। বিষণ্ণ হবার প্রাণপণ চেষ্টা করি, মন কিছুতেই বিষণ্ণ হয় না। কোন ব্যাপারেই মনের আমার সাড়া মেলে না। বন্ধুত্বের মূল্য আমার কাছে ফুরিয়ে গেল। নিঃশেষ হল নারীর প্রয়োজন। যতক্ষণ কেউ সামনে থাকে, যতক্ষণ তাকে চোখে দেখি—ততক্ষণ সে সত্যি। কিন্তু চোখের আড়াল হওয়ার সাথে সাথে হয়ে যায় মনেরও আড়াল। ঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে বসে বাইরে ঝড়ের মাতন, জানালায় বৃষ্টির দাপাদাপি দেখে মানুষ যেটুকু বিচলিত হয়, এমন সব গুরুতর ঘটনায় তার চেয়ে বেশি বিচলিত আমি হইনে। আমার আর পৃথিবীর মাঝখানে যেন গড়ে উঠল স্বচ্ছ একটি ব্যবধানের প্রাচীর। স্বচ্ছ, ভঙ্গুরও হয়ত—তবু একে ভেঙে ফেলবার শক্তি-সাহস নেই আমার।

অবশ্য, এহেন মানসিক অবস্থার কথা টের পেয়েও পরিণামে আতঙ্কের কোন কারণ আমি দেখিনি। কেননা, আগেই বলেছি, নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারেও প্রথম থেকে আমার

একটা নিরাসক্তির ভাব ছিল। দুঃখের চরম আঘাতেও কক্ষনো আমি ভেঙে পড়িনে। তাই আমার এই আত্মিক ক্লীবতার কথা বন্ধুবান্ধবরা জানতে পারল না।

মানসিক নিষ্ক্রিয়তাকে ঢাকবার জন্যে সামাজিক জীবনে আমি কৃত্রিম উচ্ছ্বাসের আশ্রয় নিলাম। সকলের চোখে আমি থেকে গেলাম সেই পুরনো আমি, আগেকার মতই হেসে-খেলে ফুর্তি করে জীবন কাটাই—আমার ভেতরের পরিবর্তনের হদিশ কেউ পেল না।

এমনি করে দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায়—মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। হঠাৎ একদিন সকালে আয়নার দিকে চোখ পড়তেই থমকে গেলাম—রগের কাছে কয়েকটি চুলে পাক ধরেছে। যৌবনের অবসান সমাসন্ন। কিন্তু লোকে যাকে 'যৌবন' বলে, তাতো আমি হারিয়েছি অনেক আগেই। যৌবন যদি যায়, যাক—ওতে আমার কিছুই যায় আসে না। অসাধারণ মর্যাদা যৌবনকে তো আমি কোনোদিন দিইনি। শুধু যৌবনের কেন, নিজের ওপরেও কি বিশেষ কোন মমতা আমার রয়েছে?

বাইরে যাই করি, যাই ঘটুক—আমার মনে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। দিনগুলি ক্রমেই বেশি করে একঘেয়ে হয়ে উঠতে লাগল। অবসাদ! অবসাদ! অবসাদে অচ্ছন্ন সমস্ত মন। বার-দুনিয়ায় একের পর এক ঘটনা ঘটে—কচি কিশলয়ে শাখাগুলি সবুজ হয়ে ওঠে, এক সময় মিলিয়ে যায় ঘটনার জের —নিঃশব্দে ঝরে পড়ে জীর্ণ পাতারা—কিন্তু আমার মনে তারা সাড়া তোলে না। এমন-কি, যে-দিনটির কথা আমি বলতে যাচ্ছি তারও শুরু নিতান্ত গতানুগতিক ভাবে। অবিকল আর-

আর দিনের মত। সেদিন, উনিশ শো তেরোর সেই আটই জুন, খানিকটা বেলা করেই ঘুম থেকে উঠেছিলাম। কেননা, রবিবার এলেই আমার ইশকুল-জীবনের কথা মনে পড়ে যায়, সহজে আর বিছানা ছেড়ে উঠতে মন চায় না। হাত-মুখ ধুয়ে, খবরের-কাগজটায় একটুখন চোখ বুলিয়ে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। রোজকার মত হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চললাম গ্রাবেন-এর দিকে। পথে চেনা-জানা জনাকয়েকের সঙ্গে দেখা হল, নিঃশব্দে অভিবাদন জানালাম কাউকে, কারো সঙ্গে বা-দুয়েকটা কথার বিনিময় হল। দুপুরের খাওয়া সারলাম এক বন্ধুর বাসায়।

রবিবারের বিকেলটা আমি স্বাধীনভাবে খুশিমত কাটাতে চাই বলে সেদিন বিকেলে কারো সঙ্গে কোন এনগেজ-মেণ্ট করি নি। বন্ধুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সবে রিঙ্গষ্ট্রাস পেরিয়েছি—শেষবসন্তের অপরূপ অপরাহ্ণে সূর্যকরোজ্জ্বল শহরের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কী আশ্চর্যসুন্দর এই সূর্যাস্তের রঙ! কী মনোরম পরিবেশ! চোখেমুখে সকলের খুশীর রোশনাই। রাস্তায় মানুষের অবিচ্ছিন্ন মিছিল, ছুটির আনন্দে দিশেহারা সবাই। উচ্ছল-উদ্দাম আনন্দের স্রোত। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম, দেখতে লাগলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ফুটপাতের কিনারে গাছ-গাছালির সবুজ সমারোহ, সামনে প্রসারিত এ্যাশফল্টের প্রশস্ত সড়ক—এই বৈষম্যটা চোখে বড় বাজল। প্রায় রোজই তো এই পথ দিয়ে যাতায়াত করি, কিন্তু রবিবারের বিকেলের এই চলমান জনতার দিকে তাকিয়ে আজ কেমন দুর্বোধ্য একটা বিস্ময় মনে জেগে উঠেছে। আরো বেশি সবুজের সমারোহ, আলোর বর্ণাঢ্য, রঙের বৈচিত্র্য আর খুশীর

রোশনাই ছচোখ ভরে দেখবার জন্তে মন আমার ব্যাকুল হয়ে উঠল। কেমন হয়েছে এখন প্রেটার-অঞ্চলটা? বড় কৌতূহল জাগছে। বসন্তের শেষ, গ্রীষ্মের শুরু। সবুজপোশাক দানব প্রহরীর মত পথের দুপাশে গাছের সার। গাড়ির ভিড়। পায়চারি করছে সুবেশ নর ও নারীর দল, টুপ টুপ করে তাদের ওপর ঝড়ে পড়ছে শ্বেতশুভ্র পুষ্পমুকুল—ওই গাছেদের নিঃশব্দ সওগাত।—প্রেটারের এই দৃশ্যটা মনে করে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলাম না। একটা ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি সেটাকে থামালাম। কোচোয়ানকে নির্দেশ দিলাম প্রেটারের দিকে গাড়ি চলাতে।

'রেসে যাবেন সাহেব?' সবিনয়ে সে জিজ্ঞেস করল।

তার কথায় মনে পড়ে গেল—সত্যিই তো, আজ না রেসের দিন। সারা ভিয়েনা আজ রেসের মাঠে ভেঙে পড়বে। আশ্চর্য! গাড়িতে উঠতে উঠতে আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, আজ রেসের দিন, অথচ কী আশ্চর্য, একেবারে, কথাটা আমার মনে হয় নি! ক'বছর আগে কি এটা কল্পনাও করতে পারতাম! বিকলাঙ্গ যেমন তার বিকল অঙ্গটি চালনা করতে গিয়েই সচেতন হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে, নিজের এই বিস্মৃতির কথা মনে হওয়া মাত্র আমিও বুঝলাম—কী ভয়ানক মানসিক অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি।

পথ প্রায় জনবিরল। রেস নিশ্চয়ই অনেক্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছে। তাই অবিরাম গাড়িঘোড়ার ভিড়ের বদলে এখন শুধু চোখে পড়ে ইতস্তত দুচারটে ছ্যাকরা গাড়ি—খট খট্ শব্দ তুলে ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে।

কোচোয়ান তার আসন থেকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, সে-ও ওদের মত জোর কদমে ঘোড়া ছোটাবে কিনা ? কিন্তু, না, কোন তাড়াহুড়ো নেই আমার। ধীরে-সুস্থে তাকে গাড়ি চালাতে বললাম। জীবনে রেস অনেক দেখেছি, অনেক খেলেছি—আজ দুমিনিট দেরি করে গেলে কিছু হবেনা। বরং ঘোড়ার গাড়ির ঢিমেতেতালা মন্থর এই ছন্দটি এখন বড় ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে, জাহাজের দোলায় দুলছি যেন। ধীরে ধীরে গাড়ি চলেছে, ভালোভাবে তাই দেখতে পাচ্ছি চারপাশ। মাঝে মাঝে চেস্টনাট কুঞ্জ, হাওয়ার ছোঁয়ায় দুলছে ফুলের স্তবক, ঝুর ঝুর করে ঝরছে পাঁপড়ি—ফুলে ফুলে শাদা হয়ে গেছে নিচেকার মাটি। কী সুন্দর! আবেশে আপনা থেকে নেমে আসে চোখের পাতা। ভালো লাগে চোখ বুজে বুক ভরে শ্বাস নিতে। বসন্তের আবির্ভাব আশ্চর্য একটা সুরভি ছড়িয়ে দিয়েছে আকাশে বাতাসে। কেমন একটা মাদকতার আমেজ সর্বত্র। ঝিমিয়ে আসে সমস্ত চেতনা। কী দরকার রেসের জন্যে তাড়াহুড়ো করে? এই ভালো! এই ভালো! ভালো এই প্রশান্তি। এই অনাবিল শান্তি।

রেসকোর্সের গেটে এসে গাড়ি থামতে সচেতন হয়ে উঠলাম, সঙ্গে সঙ্গে মনটা খারাপ হয়ে গেল। একবার ভাবলাম, ফিরে যাই। গাড়ির দোলায় দুলে কাটাই আরো ঘণ্টাখানেক। অপরূপ এই অপরাহ্ন—দুচোখ মেলে এর রূপৈশ্বর্যের দিকে তাকিয়ে থাকি আরো কিছুক্ষণ। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছে কি ফেরা আর যায়!

হঠাৎ রেসের মাঠ থেকে প্রচণ্ড একটা হট্টগোল ভেসে এল। সহস্র-হাজার কণ্ঠের মিলিত গর্জন, ঝটিকাউত্তাল

সমুদ্র যেন আছড়ে পড়ল তীরের প্রতিরোধে। যারা গর্জন করে উঠল, চোখে তাদের এখনো দেখতে পাচ্ছিনে। শুধু অনুভব করছি জনতার উদ্দাম উন্মাদনা। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল অস্টেণ্ডের কথা। শহরতলী থেকে কোন্ সংকীর্ণ গলি-পথ দিয়ে এসপ্লানেডের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ বাতাসে ভেসে আসে লবণের আঘ্রাণ, কানে এসে বাজে দূর সমুদ্রের গুরু-গুরু। অথচ, সমুদ্র তখনো চোখের আড়াল। সমুদ্রের অস্তিত্ব তখন শুধু অনুভব করা যায়—ধূসর জলরাশির অথৈ বিস্তার চোখে পড়ে না, চোখে পড়ে না তীর ও তরঙ্গের প্রবল সংঘাত।

সত্যিই যে একটা রেস শুরু হয়ে গেছে, জনতার এই গর্জন তার প্রমাণ। আমার আর রেসকোর্সের মাঝামাঝি জায়গায় ছুটোছুটি করছে বিচিত্রবেশ বহু নরনারী, ছটফট করছে স্নায়ুবিকারের রোগীর মত। রেসের হালচাল বোঝা যায় দর্শকদের চোখমুখের দিকে তাকালে। এই রেসটা হয়ত এখন শেষ হয়-হয়। দলবেঁধে ঘোড়াগুলো আর কদমে ছুটছে না—আগে-পিছে পড়ে গিয়েছে, জয়ের জন্যে দেখা দিয়েছে প্রাণপণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ঘোড়দৌড় দেখতে পাচ্ছিনে কিন্তু দর্শকদের একাংশ চোখে পড়ছে। তাদের মুখে একটা না একটা ঘোড়ার নাম, গলা ফাটিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে ঘোড়াদের। নিজেরাও ফেটে পড়ছে উত্তেজনায়।

তাদের মাথার গতিবিধির দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, আকর্ষণের কেন্দ্রটা বর্তমানে কোন্‌খানে। প্রত্যেকের মুখ একদিকে ফেরানো। হাজার কণ্ঠের গর্জনে মুখরিত দশদিক। কয়েকজনের মুখের দিকে সন্ধানী চোখে তাকালাম: বিভ্রান্ত, অর্ধোন্মাদ। অপলক

চোখ, তারাগুলো বুঝি ঠিকরে পড়বে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। ফুটে বেরিয়েছে চোয়ালের হাড়! থরথর নাসারন্ধ্র।

আর আমি? নিস্পৃহ নিরাসক্ত এক দর্শক! অসংযত উত্তেজনায় উন্মাদ এই মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার হাসি পেল। পরমুহূর্তে রী রী করে উঠল সর্বশরীর। কী কুৎসিত! কী কুৎসিত! কী জঘন্য! কাছেই একটি বেঞ্চির ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে একজন। পোশাকে-আশাকে রীতিমত স্মার্ট। ভদ্রলোক, সন্দেহ-কি! অন্য সময় এঁর মুখে ফুটে ওঠে অমায়িক ভদ্রতার প্রতিচ্ছবি। আর এখন—শয়তান যেন এখন ওঁকে ভর করেছে। বন্‌বন্‌ করে হাওয়ায় হাঁকাচ্ছেন হাতের ছড়িটা, অদৃশ্য ঘোড়াকে যেন মরীয়া হয়ে চাবুক কষাচ্ছেন। ঘোড়সওয়ারের ভাবভঙ্গি ফুটে উঠেছে ওঁর আচরণে। বেঞ্চির ওপর গোড়ালি ঠুকে ঠুকে শব্দ করছে তালে তালে—এখন ওটা আর বেঞ্চি নয়, জীনের রেকাব। ডান হাতে ছড়ি — ছড়ি নয়, ঘোড়ার চাবুক। বাঁ হাতে মুঠো-করে-ধরা একটা শাদা বেটিং শ্লিপ—ঘোড়ার লাগাম।

সর্বত্র এই শাদা শ্লিপ, সকলের হাতে হাতে—গর্জমান জনসমুদ্রের ওপর ফেনপুঞ্জের মত। নিশ্চয় বাঁকের মুখে কয়েকটা ঘোড়া এইমাত্র বিদ্যুৎবেগে, বেরিয়ে গেল কাঁধ ঘেঁষা-ঘেঁষি করে—তাই হঠাৎ সবাই একসাথে রণধ্বনি দিয়ে উঠল, প্রবল গর্জনে ফেটে পড়ল নিজ নিজ পেয়ারের ঘোড়ার নাম করে। উত্তেজনায় বিকারগ্রস্ত রোগীর মত হয়ে গিয়েছে মানুষগুলি—কালমাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে একেবারে।

আর, আমি! এক অটল পাহাড়ের মত আমি অবিচল দাঁড়িয়ে জনতাউত্তাল এই তরঙ্গের মাঝখানে। আমার সে-মানসিক অবস্থার অবিকল বর্ণনা দেওয়া আজ অসম্ভব। প্রথম থেকেই, সন্দেহ নেই, ব্যাপারটা আমার কাছে বড় খারাপ লাগছিল। অর্থহীন,—নিরর্থক এই উত্তেজনা স্থূলরুচি মানুষগুলোর ভাবভঙ্গির দিকে তাকিয়ে ঘৃণায় গা ঘিনঘিন করছিল। হয়ত-বা, তিক্ত একটা হাসিও ফুটে উঠে থাকবে ঠোঁটের কিনারে। তবু, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, স্বীকার করতেই হবে—জনান্তিকে আরো একটা অনুভূতি জেগে উঠেছিল আমার মনে। তার নাম—ঈর্ষা। এই প্রবল ভাবাবেগ, এই বন্য-বর্বর প্রাণোচ্ছ্বাস—এতো জীবনেরই প্রকাশ? কিন্তু তা থেকে আমি বঞ্চিত! হায়, আমি কি পারতাম উত্তেজনায় অমন করে অধীর হয়ে উঠতে? কী করলে আমিও এমন বেপরোয়া হয়ে যেতে পারতাম? পারতাম অমন করে সবার সাথে গলা মিলিয়ে পাশব চিৎকারে ফেটে পড়তে? কি করলে আমারও সারা দেহে ছড়িয়ে যেত উত্তেজনার ওই তীব্রদহন জ্বালা?

জানি নে। কত টাকার লোভানি আমার মনকে এভাবে নাড়া দিতে পারত আমি জানিনে। আদৌ পারত কি? কোন নারীও কি পারত? পারত না। অপরিমেয় অর্থ, অনন্যা নারী—আমার মনকে নাড়া দেবার সাধ্য কিছুর নেই, কারো নেই। আমার মৃত আবেগে প্রাণসঞ্চারের ক্ষমতা এই পৃথিবীতে কারো নেই, কোনকিছুর নেই। হাতে যদি একটা পিস্তল থাকত, নিজের কপাল লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপবার আগের মুহূর্তেও বুকটা আমার ধারেকের জন্যেও কেঁপে উঠত না।

অথচ মাত্র কয়েকটা টাকার জন্যে ওই হাজার হাজার মানুষ কী ভীষণ উত্তেজিতই না হয়ে উঠেছে, হয়ে উঠতে পেরেছে।

একটা ঘোড়া বোধ হয় এবার জয়-নিশানার কাছাকাছি এসে পড়েছে—লক্ষ কণ্ঠে ঘোষিত হল একটি মাত্র ঘোড়ার নাম।

তারপর শুরু হল ব্যাণ্ডের বাজনা। এবার আমার চারপাশে ভিড় বাড়ছে। নিষ্পত্তি হয়েছে জয়পরাজয়ের। থিতিয়ে এসেছে উত্তেজনা। শুরু হয়ে গেছে জোর আলোচনা। হাজার হাজার মানুষের জমাট-বাঁধা আবেগ এখন টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। ইতস্তত সবাই জোট পাকাচ্ছে। হাসছে, কথা কইছে। কেউবা ছুটাছুটি করছে। ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কয়েকজন। মুখ থেকে সবার খসে পড়েছে উন্মাদের মুখোসটি, ফুটে উঠেছে সহজ-স্বাভাবিক মুখচ্ছবি। এতক্ষণ ভদ্র-অভদ্র একাকার হয়ে গিয়েছিল, এখন যে যার মনের মত সঙ্গী বেছে নিচ্ছে। জেগে উঠেছে সামাজিক বোধ, শ্রেণী-চেতনা।

কয়েকটি চেনা মুখ চোখে পড়ল। নমস্কার বিনিময়ও করলাম। কিন্তু অধিকাংশই আমার অপরিচিত। শুধু আমার নয়, পরস্পরেরও। তবু তারাও এখন সহজ চোখে তাকাচ্ছে এ ওর দিকে। মেয়েরা ব্যতিব্যস্ত পরস্পরের সাজ-পোশাক নিয়ে। লোলুপ চোখে ছেলেরা চেয়ে মেয়েদের দিকে। সযত্নলালিত কৌতূহলই এই ধনীর দুলালদের অলস জীবনের একমাত্র উপজীব্য। মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এখন সেই কৌতূহল। কে কত বেশি স্মার্ট হতে পারে শুরু হয়ে গেছে তার প্রতিযোগিতা। আজকের রেসে কে এসেছে, কে আসেনি—খোঁজ-খবর নিচ্ছে বন্ধুবান্ধবরা। রেসের অঢেল উত্তেজনা

না সামাজিক মেলামেশা—কিসের আকর্ষণে সবাই সমাগত এখন তা বোঝার যো নেই। বোঝার যো নেই যে মাত্র মুহূর্ত কয়েক আগেও এই মানুষগুলিই উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল উত্তেজনায়।

ভিড় কেটে কেটে এগিয়ে চললাম। ভালো লাগছে পরিবেশ, গা এলিয়ে ঘুরে বেড়াতে বড় ভালো লাগছে। কেন-না, এ যে আমার দৈনন্দিন জীবনেরই অবিকল পুনরুক্তি। নেহাৎ গতানুগতিক। নিতান্তই এক সুরে বাধা। ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াই। বহুবিচিত্র নরনারীর সমাবেশ চারপাশে, কিন্তু তার চেয়েও হৃদয়গ্রাহী হঠাৎ-হাওয়ার মৃদুমন্থর হিল্লোল। দূরের অরণ্যানী থেকে মাঝে মাঝে হাওয়ার ঢেউ আসছে। ঢেউয়ের পর ঢেউ। মেয়েদের শাদা সিল্কের পোশাক কাঁপছে সেই হাওয়ায়, কাঁপছে ঝিলমিল করে।

চেনাশোনা কেউ কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইল। যেমন, ডায়না। নামকরা সুন্দরী অভিনেত্রী ডায়না। নিজের আসনে বসে অপলক চেয়ে ছিল আমার দিকে। ভ্রূক্ষেপ করলাম না। ফ্যাশানের এই পুতুলগুলির সঙ্গে বাক্যালাপের কোন উৎসাহ নেই আমার। ওদের আয়নায় আমি নিজেকে দেখতে চাইনে। সে বড় বিরক্তিকর। ভাবতেও ঘেন্না হয়। আমি দর্শক। নিস্পৃহ, নিরাসক্ত দর্শক। চোখ মেলে শুধু দেখে যেতে চাই, দেখে যেতে চাই জীবনের এই বহুমুখী প্রকাশ, সাময়িক উত্তেজনার এই বিচিত্র অভিব্যক্তিটুকু। এসবের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি আগন্তুক মাত্র।

কয়েকটি সুন্দরী পাশ দিয়ে চলে গেল। চোখ বড় বড় করে তাকালাম, তাকিয়ে রইলাম। (মনে কিন্তু কামনা-বাসনার

কণামাত্র জাগে নি।) ওরা বিব্রত হয়ে উঠল: আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে বলে খুশী, আমার দৃষ্টির সামনে পড়ে গিয়ে অস্বস্তি। কৌতুক বোধ করি ওদের এই অস্বস্তি দেখে। জানি আমার জন্যে ওদের কোন মাথাব্যথা নেই, তবু ভাবতে ভাল লাগল যে আমার সম্পর্কে ওরা সচেতন হয়ে উঠেছে, কৌতূহলী হয়েছে। মজা লাগছে পরের বাসনার শিখাকে উস্‌কিয়ে দিতে। নিজের রক্তে বাসনার দাহ ভোগ করার চেয়ে অন্যের দেহেমনে বাসনার আগুণ জ্বালিয়ে তোলাতেই আনন্দ আমার বেশি। এনক্লোজারের আশেপাশে পায়চারি করি। মেয়ে দেখলেই সরাসার তাকাই, তারাও ফিরে ফিরে চায়। কটাক্ষ হানে। কিন্তু মনের গভীরে আমার আলোড়ন জাগেনা। এ যেন চোখ চাওয়াচাওয়ি এক খেলা! শুধুই খেলা!

এই খেলাও কিন্তু বেশিক্ষণ চলল না। ঘুরে-ফিরে একই লোকদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। চেনা হয়ে গেছে সবার মুখগুলি, সকলের ভাব-ভঙ্গি। একঘেয়ে লাগে, বিরক্তি জাগে। আর ক্লান্তি। ক্লান্তিতে মন অবসন্ন হয়ে এল। খালি দেখে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম।

জনতার মধ্যে ফের নতুন করে উত্তেজনার সঞ্চার হচ্ছে। আবার অধীর হয়ে উঠছে সবাই ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিয়েছে। আরেকটা রেস এবার শুরু হবে। হোক, আমার তাতে কী! নির্বিকার বসে তাকিয়ে রইলাম হাতের সিগারেটের দিকে। পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। উঠছে, ওপরে উঠছে—আরো ওপরে—আস্তে আস্তে এবার ছড়িয়ে পড়ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে সুনীল শূন্যে। বিস্মিত আমি তাকিয়ে, মন্ত্রমুগ্ধ।

আর, আমার সেই অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার—আজো যার জের মেটে নি, আজো যার প্রভাব জীবনে আমার অপরিসীম—সূচনা হল এই সময়।

স্পষ্ট মনে রয়েছে সেই মূহূর্তটি। এখনো জ্বলজ্বল করছে চোখের সামনে। হাতঘড়িটার দিকে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটা ঘটল। নিজের হাতের দিকে তাকালাম, তাকালাম ঠিক ইচ্ছে করে নয়, আপনা হতেই চোখ পড়ে গেল—দেখলাম, আড়াআড়ি ভাবে রয়েছে দুই হাত আমার। ঘড়িতে তিনটে বেজে পনেরো।

উনিশ শো তেরোর আটই জুন, বিকেল সওয়া তিনটে—শাদা ডায়ালের দিকে নির্নিমেষ আমি—সামান্য একটা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে মন ভরে উঠেছে, শিশুয়ালী একটা খুশীর উচ্ছ্বাস জাগছে—হঠাৎ কানে এসে বাজল মেয়েলি হাসির কলধ্বনি। খিলখিল করে আমার পিছনে হেসে উঠল এক নারী। মাদকতাময়, প্রাণোচ্ছল হাসি। আচমকা এই হাসি শুনে ছলকে উঠল বুকের রক্ত। আমি ভালোবাসি মেয়েদের এই হাসি, বড় প্রিয় এই হাসি আমার। বাসনার আগ্নেয় বিস্ফোরণ এই হাসি।

ইচ্ছে হল, ফিরে তাকাই। দেখি, কে হেসে উঠল অমন করে, কার হাসি ভেঙে দিল আমার তন্ময়তা, আমার নিস্তরঙ্গ জীবনের পচা ডোবায় হাসির নুড়ি ছুঁড়ে কে তুলল তরঙ্গের আলোড়ন। কিন্তু, সংযত করলাম নিজেকে, ফিরে তাকালাম না। যদি না-ই তাকাই, কি হবে? দেখা যাক কি হয়! দেখা যাক আমার মনে এর কোন্ প্রতিক্রিয়া ঘটে। দেখিই না মন আমার কী করে। এভাবে ইচ্ছের রাশ ধরে রেখে

মনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে ভালোবাসি আমি। এ ধরনের মনস্তাত্বিক একস্‌পেরিমেণ্ট এক বিলাস আমার।

ওই কলহাসিনীর মুখ এখন দেখতে চাইনে, মনে মনে শুধু কল্পনা করব মুখখানি ওর। মুখ আর ঠোঁট, গলা আর উন্নত বুকটি দেখব আমার মনের চোখ দিয়ে। পরিপূর্ণ অবয়বটি গড়ে তুলব কল্পনায়। ফিরে না তাকিয়েও প্রত্যক্ষ করতে চাই জীবন্ত এক নারীকে—মনের চোখে, মনে মনে। পরে দেখা যাবে কতখানি মিল হয় বাস্তবের সঙ্গে আমার কল্পনার।

মেয়েটি রয়েছে ঠিক আমার পিছনে। হাসি থামিয়ে এখন কথা কইছে। উৎকর্ণ হলাম। ভঙ্গিতে ঈষৎ হাঙ্গেরীয় টান্, তাড়াতাড়ি কথা কইছে, অনর্গল বকে চলেছে, গায়িকার মত সুরেলা।

আমার কল্পনার মেয়েটি কথা কইছে এই ভাবে? ভাবতেও বিস্ময়। মনের মেয়েটির চেহারা পূর্ণাঙ্গ করে তুললাম মনে মনেঃ মাথায় তার বসিয়ে দিলাম ঘনকৃষ্ণ কেশদাম, গভীর-কালো রঙ দিলাম দুই চোখের তারায়, ঠোঁট দুটি করে দিলাম কামনাস্ফুরিত —শক্ত শাদা তুসার দাঁত, ছোট্ট টিকলো নাক, কিন্তু নাসারন্ধ্র তুলনায় বড়। বাঁ গালে বসিয়ে দিলাম ছোট্ট কালো তিল একটি। আর হাতে দিলাম ঘোড়ার চাবুক, হাসতে হাসতে চাবুক দিয়ে আলতোভাবে আঘাত করছে নিজের স্কার্টে। একটানা কথা বলে চলেছে মেয়েটি, কান পেতে আমি শুনছি। শুনছি, আর মনে মনে সম্পূর্ণ করে তুলছি তার চেহারাটি। নিশ্চয় ছোট-ছোট দুটি কুমারী স্তন রয়েছে, পরনের পোশাক গাঢ়-সবুজ, কোমরবন্ধনীর মুখে হীরের ফুল। টুপিটির রঙ ফিকে, টুপির মাথায় পাখির শাদা পালক।

ছবিটি ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে, পিছনে থাকলে কি হবে, আমার চোখে ওর প্রতিবিম্ব পড়েছে। নাজানা ওই অদেখা মেয়েটিকে হুবহু এখন দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু, না, তবু এখন পিছন ফিরে চাইব না। আমার কল্পনার সাথে একাকার হয়ে গেছে কী-এক কামনা, মোহাচ্ছন্ন করে ফেলেছে আমায়। চোখ বুজলাম, বুজে রইলাম। প্রতীক্ষা—প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। মনে মনে যেন নিশ্চয় করে জানি; যদি চোখ মেলি, চোখ মেলে যদি ফিরে তাকাই—দেখব আমার কল্পনার বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

এই সময় ও একটু এগিয়ে এল। পায়ের সাড়া পেয়েই আমি চোখ খুললাম, অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

আর, চোখ মেলে চাইবার সঙ্গে সঙ্গে মন-মেজাজ একেবারে বিগড়ে গেল। ভুল! ভুল! ভুল! সব—সব ভুল। সব কিছু আলাদা, আমার কল্পনার ছবিটির সাথে এতটুকু মিল নেই। পরনে সবুজ নয়, শাদা গাউন। গালদুটি ট্যাবা ট্যাবা। তিল? কই তিল! টুপি তো নয়, শিরস্ত্রাণ। নিচে তার কয়েকগাছা চুল, কৃষ্ণকুন্তলা নয়, পিঙ্গল কেশী। সব কিছু বিপরীত আমার কল্পনার। মনে মনে যে মেয়েটির ছবি আমি এঁকেছিলাম, তার সাথে এর একটুও মিল যদি থাকে!

তবে, হ্যাঁ, সুন্দরী! চোখে পড়বার মত সুন্দরী বটে। কিন্তু সেটা স্বীকার করতে বাধছে আমায়। মনস্তাত্ত্বিক বলে বড় অহমিকা ছিল, ওরই জন্যে সেটা খানখান হয়ে গেল। অতএব হোক সুন্দরী, স্বীকার আমি করব না।

চোখ কুঁচকে তাকালাম। দুচোখে চরম বিতৃষ্ণা ফুটিয়ে তুলতে চাইলাম। তবু, চমক লাগে বৈকি। কী লীলায়িত দেহলতা! ছন্দিত উচ্ছল যৌবন! চোখ ফেরানো দুষ্কর। কামনার হাতছানি যেন সর্বাঙ্গে। কলকল শব্দে আরও একবার হেসে উঠল, ঝিকিয়ে উঠল সুন্দর সুবিন্যস্ত দাঁতের সার। এমন হাসিই ওকে মানায়। ধ্বক করে ওঠে বুকে ওই হাসি শুনে। হাসি তো নয়, লালসার শাণিত ছুরি। সবকিছু ওর উগ্র, সোচ্চার। পুরুষকে যেন চ্যালেঞ্জ করছে। সুগঠিত চেহারা, তন্বী—উদ্ধত স্তন। বেপরোয়া হাসি। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। খড়্গ-নাসা। একহাতে ছাতা। ছাতাটি যেন মাটিতে পুঁতে দাঁড়িয়েছে বুক চিতিয়ে। এ সেই আদিম নারী—আরণ্যক প্রাণের, দুরন্ত জীবন-যৌবনের, রাশমুক্ত লালসার, সচেতন শয়তানীর মূর্তিমতী প্রতীক। পাশে এক সামরিক অফিসার। ফিট-ফাট চেহারা, কাটখোট্টা শরীর। ওর সাথে কথা বলছে। স্বরে কেমন চেষ্টাকৃত উৎসাহ। সঙ্গীর কথা শুনছে মেয়েটি, হাসছে মৃদু-মৃদু, সাড়া দিচ্ছে মাথা নেড়ে নেড়ে, কখনো-বা লুটিয়ে পড়ছে বাঁধভাঙা হাসির উচ্ছ্বাসে। এ-হাসি নিছক লোক-দেখানো। কান হয়ত সঙ্গীর দিকে, লোলুপ চোখ, দুটি ঘূর্ণায়মান চারপাশে। পাশ দিয়ে কেউ গেলেই কটাক্ষ হানে, তার মনকে টানে, হাসির উপহার কেড়ে আনে। পুরুষ হলে তো কথাই নেই। নজর বরং সেইদিকেই বেশি। গ্র্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের দিকে তাকিয়ে ছটফট করছে চোখের তারা, ঝিলিক দিয়ে উঠছে থেকে থেকে—চেনা মুখ চোখে পড়লেই। তারপর ফের শুরু হয় আঁতিপাতি করে খোঁজা।

মুখের হাসিটি অমলিন, সঙ্গীর দিকে তেমনি উৎকর্ণ—এবার সে মুখ ফিরিয়ে তাকাল নিজের ডান পাশে। তারপর বাঁয়ে। কিন্তু একবারো দেখতে পেল না আমায়। কি করেই বা পাবে, আমি তার বাবুটির আড়ালে। বিরক্ত হলাম। ঘাড় উঁচিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম, তবু তার নজর পড়ল না। এবার এগোতে লাগলাম, একপা একপা করে—কিন্তু ও ততক্ষণে ফের চোখ মেলে দিয়েছে গ্র্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের অভিসারে।

ইচ্ছে করেই ওর একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। টুপি খুলে অভিবাদনও জানালাম। এগিয়ে দিলাম নিজের চেয়ারখানা।

আমার দিকে তাকাল। অবাক হয়ে গিয়েছে। চোখের কোণে চকিত কটাক্ষ, ঠোঁটের কিনারে চটুল হাসি।

অস্ফুট স্বরে ধন্যবাদ জানিয়ে চেয়ারটি টেনে নিল। বসল না, দাঁড়াল চেয়ারের পিঠে হাতের ভর দিয়ে, ঝুঁকে পড়ল আরো-একটু সামনের দিকে। শরীরের প্রত্যেকটি রেখা এবার স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর। ও-ই করে তুলল, ইচ্ছে করে।

ভুলে গেলাম যে একটু আগেই মেয়েটার ওপর আমি ক্ষেপে গিয়েছিলাম। ক্ষেপে গিয়েছিলাম আমার কল্পনার সাথে ওর কোন মিল খুঁজে না পেয়ে। মন আমার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। মেয়েটিকে নিয়ে সে এখন খেলা করতে চায়। খেলা। শুধুই খেলা!

মন মেতে উঠল এই খেলায়।

একটু পিছনে সরে দাঁড়ালাম, গ্র্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের পাঁচিলের পাশে। ওর চোখে না পড়েও এখান থেকে ভালো করে ওকে

লক্ষ্য করতে পারব, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে পারব ওর প্রতিটি চালচলন।

কিন্তু, আমি যে অনিমেষ ওর দিকে তাকিয়ে, কি করে যেন ও-ও সেটা টের পেয়ে যায়। আনমনে ফিরে দাঁড়াল আমার দিকে। যেন ইচ্ছে করে ফেরে নি, এপাশ-ওপাশ তাকাতে তাকাতে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আমার অনুচ্চারিত আকাঙ্ক্ষাকে ও শাসন করল না। নিষেধের কোন ইশারাও চোখে মুখে ফুটিয়ে উঠল না। বরং প্রশ্রয় দিল—সুস্পষ্টভাবে নয় অবশ্য।

কী-এক অস্বস্তিতে মেয়েটা অধৈর্য হয়ে উঠছে। খালি চনমন করে তাকাচ্ছে চারদিকে। কিছুতেই স্থির হতে পারছে না, এক লহমার বেশি কোনদিকে তাকিয়ে থাকতেও না।

আমার দিকে চোখ পড়তে হেসে ফেলল। কেন হাসল? এই হাসির কি বিশেষ-কোন অর্থ রয়েছে? কী বলতে চায় ও?

জানিনে, বুঝতে পারছিনে। সংশয় জাগছে। মনের মধ্যে কাঁটার মত খচখচ করছে সংশয়টা। সংশয়ের জ্বালায় উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। কেন ও হাসল আমার দিকে তাকিয়ে? কেন? কেন?

মাঝে মাঝে ওর চাউনির তীর এসে বিঁধছে। পূর্ণ সম্মতির স্বাক্ষর যেন ফুটে উঠেছে দুটি চোখে। কিন্তু আমার দিকেই তো শুধু এইভাবে তাকাচ্ছে না। কটাক্ষ হানছে প্রত্যেককে, বাছবিচার নেই—পুরুষ হলেই হল। আসলে এই যেন ওর স্বভাব—নির্লজ্জ এই ছেনালপনা। সঙ্গের বাবুটিকে ছাড়তে নারাজ, বাইরের দিকেও নজর পুরো। একসাথে বজায় রাখছে দুইকূল। বেহায়া! কী বেহায়া! তবে

কি এই ওর পেশা ? নাকি বড়-বেশি কামুক, তাই ছটফটানি এতখানি ? আরো এক পা এগোলাম। ওর ভাবভঙ্গিতে কেমন একটা নেশা জাগছে। চোখ নয়, এবার তাকালাম ওর শরীরটার দিকে। সরাসরি, ইচ্ছে করে। একদৃষ্টে দেখতে লাগলাম পা থেকে মাথা পর্যন্ত, প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দুই চোখে ফুটিয়ে তুললাম নির্লজ্জ লোলুপতা। আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে ও-ও তাকাল নিজের দিকে। তবু বিব্রত হল না, বরং মুখে ফুটে উঠল ঈষৎ হাসির বঙ্কিম রেখা। বাবুটির কোন কথা শুনেই যেন হাসল এইভাবে। আমি কিন্তু বুঝলাম এই হাসির হেতু অন্য, অন্যত্র। আমিই লক্ষ্য এই হাসির। এই হাসি আমার ওই নির্লজ্জ লোলুপ দৃষ্টিপাতের জবাব।

শাদা স্কার্টের তলায় নিটোল দুটি পা—তাকালাম পায়ের দিকে, তাকাল ও-ও। তারপর, কিছু না ভেবেই যেন, একটি পা তুলে রাখল পাশের চেয়ারের উপর। স্কার্ট সরে গেল, হাঁটু পর্যন্ত নগ্ন হয়ে পড়ল। হেসে হেসে কি বলছিল তার সাথীকে, এবার বদলে গেল সেই হাসির ধরন। নিঃশব্দ চটুল হাসিতে মুখখানি ভরে উঠল।

অর্থাৎ, আমি যেমন ওর সাথে খেলা করছি, ও-ও তেমনি খেলাচ্ছে আমায়। বলিহারী সাহস! কী সেয়ানা! তারিফ করতেই হয়। হোক মন ওর প্রতি বিরূপ, বাহাদুরি না দিয়ে তবু উপায় কী। ভালো করে যাতে ওর দৈহিক সৌন্দর্যটা আমার নজরে পড়ে চেষ্টার অন্ত নেই সেজন্যে। ওদিকে আবার লোকটার সঙ্গেও কথা বলে যাচ্ছে ফিসফিসিয়ে। একসাথে খেলাচ্ছে দুজনকে।

এবার আমি বিরক্ত হলাম। হিসেব করে হুঁশিয়ার থেকে যারা ইন্দ্রিয়াসক্ত হয় তাদের আমি সইতে পারি নে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের কথা মনে পড়ে যায়। তাই আমার অবসন্ন মনের কাছ থেকে আর কোন সাড়া পাচ্ছিনে। না পাই সাড়া, তবু উত্তেজনা এখনো বোধ করছি বইকি। এই উত্তেজনার পেছনে কামনা নেই, বিরূপতা আছে। যত বেশি বিরূপ হয়ে উঠছি মেয়েটির উপর, তত বেশি উত্তেজনা জাগছে দেহে, মনে।

আরো-একটু এগিয়ে গেলাম, তাকালাম তার উদ্ধত তুই স্তনের দিকে। চোখের ভাষায় বলতে চাইলাম, 'তোমায় আমি চাই। বুঝলে সুন্দরী, তোমার ওই দেহটাকে আমি—' নিজের অজান্তেই হয়ত আমার ঠোঁট তুটি থরথরিয়ে উঠেছিল, অবজ্ঞার হাসি হেসে ও মুখ ফেরাল। স্কার্ট টেনে নামিয়ে দিল। বেশবাস ঠিক করে নিল। কিন্তু, খানিক পরেই আবার যে-কে-সেই। চঞ্চলকালো চটুল চোখ জোড়া ফের চনমন করতে লাগল আগের মতই।

হ্যাঁ, এই আমার সত্যিকারের সঙ্গিনী। অবিকল আমারি মত নিরাসক্ত। বাইরে আমরা যাই করিনে, মনের গভীর আমাদের আলোড়িত হয় না। তুজনেই আগুন নিয়ে খেলা করছি। কিন্তু আসলে এ তো আগুন নয়, দেখতেই শুধু আগুনের মত—ছবিতে আঁকা আগুনের শিখা। সময় কাটাবার চমৎকার একটা উপায় পাওয়া গেছে। বড় একঘেয়ে লাগছিল, খানিকটা বৈচিত্র্যের সন্ধান তবু মিলল।

হঠাৎ ওর চনমনে ভাবটা উবে যায়। শান্ত হয়ে আসে তুই চোখ। হাসি-হাসি মুখের উপর ফুটে ওঠে বিরক্তির কুঞ্চন।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালাম—বেঁটে-মোটা নোংরা-পোশাক একটি লোক হন হন করে এগিয়ে আসছে। ঘেমে-নেয়ে উঠেছে, রুমাল দিয়ে কেবলি ঘাড়-গলা মুছছে। টুপি খোলা, মাথাভর্তি চকচকে টাক। (টাকের উপর অজস্র স্বেদবিন্দু বিজ-বিজ করছে, তার ওপর টুপিটি বসানো—দৃশ্যটা মনে মনে কল্পনা করতেই আমার বমি এল।) এক হাতে কয়েকটি বেটিং শ্লিপ। উত্তেজনায় লোকটা স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না।

স্ত্রীর দিকে দৃকপাত না করে সে অফিসারটির সঙ্গে হড়বড় করে কথা বলতে লাগল। কথাবার্তার ধরন গেঁয়ো, অমার্জিত। লোকটা যে পাকা রেস্থুড়ে, সন্দেহ নেই। হয়ত ঘোড়ার কারবার করে। হয়ত রেস খেলা ওর কাছে নিছক খেলা নয়, তার চেয়েও অনেক-কিছু বেশি। স্ত্রী অস্ফুট স্বরে কিছু বলে থাকবে (স্বামীর আগমনে সুন্দরী চটেছেন, তাঁর উচ্ছ্বাস একেবারে উঠে গিয়েছে), কেননা তাড়াতাড়ি সে টুপিটি পরে নিল। তারপর অমায়িক হেসে কাঁধ চাপড়ে আদর জানাল সহধর্মিণীকে।

দাম্পত্য অন্তরঙ্গতার এ-হেন প্রকাশে শ্রীমতী বিরক্ত, বুঝলাম। অফিসারটির, বিশেষ করে আমার সামনে, স্বামীর এই আদিখ্যেতায় চটে গিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকাল। স্বামী বেচারা বেকুব। মনে হল, যেন মিনমিনে স্বরে মাপও চাইল, তারপর আগেকার মত কথা শুরু করে দিল অফিসারটির সঙ্গে।

শ্রোতা মুখে কিছু বলছেন না, সৌজন্যসূচক হাসি দিয়ে হুঁ-হাঁ করে যাচ্ছেন।

খানিক পরে স্বামী ফের স্ত্রীর একটি হাত কাছে টেনে নেয়। স্ত্রীকে আপ্যায়নের জন্যে ফের উদ্ব্যস্ত হয়ে ওঠে। অবশ্য, এবার কিছুটা ভয়ে ভয়ে, সন্তর্পণে। স্বামীর ব্যবহারে মেয়েটা যে চটে যাচ্ছে, স্পষ্ট দেখছি। চাপা অস্বস্তিতে হাঁসফাঁস করছে। আর তাই দেখে মজা লাগছে আমার, হিংস্র একটা আনন্দ অনুভব করছি।

মেয়েটা কিন্তু সত্যিই বড় সেয়ানা। একটুক্ষণের মধ্যেই সামলে নিল। স্বামীর সোহাগে বিরক্ত হচ্ছিল, আর এখন নিজেই সোহাগ ভরে স্বামীর একটি বাহু নিজের কোমরে চেপে ধরল। ধরে, তেরছা চোখে তাকাল আমার দিকে। যেন বলতে চাইল, 'অমন হাঁ করে কী দেখছিলে? আমার মালিক তুমি নও—এ। বুঝলে?'

আহত হলাম। ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলাম। ইচ্ছে হল, এই মুহূর্তে স্থান ত্যাগ করি। চলে যাই আর-কোথায়। মেয়েটার মুখের ওপর জানিয়ে দিই যে অমন একটা আজেবাজে লোকের অর্ধাঙ্গিনী সম্পর্কে কোন কৌতূহল নেই আমার। কিন্তু পারলাম না। ওর মোহিনী মায়ায় যেন চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়েছি। দাঁড়িয়ে রইলাম। ছবির মত।

আবার রেস শুরু হচ্ছে, সিগন্যাল দেওয়া হল। লোকেরা এতক্ষণ এখানে-ওখানে জোট বেঁধে গল্পগুজব করছিল, দেখতে-না-দেখতে হুড়মুড় করে দৌড়ে গেল রেলিংয়ের দিকে। জোর করে নিজেকে আমি সংযত রাখলাম। না, জনতার স্রোতে গা ভাসাতে আমি চাইনে, আমি থাকব মেয়েটির কাছে কাছে।

অতঃপর চোখের চাউনি কি হাতের ইশারা, কিংবা অন্য যে ভাবেই হোক—ঠিক মনে সেই—তুজনের মধ্যে চরম বোঝা-পড়া হয়ে গেল। বেপরোয়ার মত ওর দিকে আমি এগোলাম এবার, জনতার ভিড় ঠেলে ঠেলে। স্বামী নামক জীবটিও হঠাৎ, বোধ হয় দাঁড়াবার জন্যে যুৎসই একটা জায়গার খোঁজেই, দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটতে শুরু করল গ্র্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের দিকে। মুখোমুখি পড়ে গেলাম তুজনে। প্রচণ্ড সংঘর্ষ হল। বেচারার মাথা থেকে ছিটকে গেল টুপিটা। কোমরবন্ধনীর খাঁজে গোঁজা ছিল বেটিং শ্লিপগুলি—নীল সবুজ শাদা কয়েকটি প্রজাপতির মত সেগুলো ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে।

লোকটা কটমট করে আমার দিকে তাকাল। আমি যথারীতি মার্জনা চাইতে যাচ্ছিলাম, সামলে নিলাম। শয়তানী একটা মতলব খেলে গেল মাথায় আমার। ঠোঁট চেপে আমিও তাকালাম কটমটিয়ে। চটুক, চটুক ও—তাতেই আমার আনন্দ।

লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হল। চোখে চোখে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। থতমত খেয়ে গেছে, বিরক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সচেতন হয়ে উঠল পরমুহূর্তেই। বেটিং শ্লিপগুলির কথা মনে পড়ে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে গেল মুখখানা, ফ্যালফ্যাল করে এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে তাড়াতাড়ি সেগুলো কুড়োতে শুরু করল।

লোকটার দিকে তাকিয়ে বড় মায়া হল আমার।

ওদিকে ওর গৃহিনীও চটে গিয়েছে ভীষণ। তুই চোখে আগুন জ্বেলে তাকিয়ে আমার দিকে। তুরন্ত আক্রোশে আমায় যেন কষে একটা থাপ্পড় মারতে চাইছে—কথাটা মনে হতেই

গোপন পুলকে আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম। আহা! সত্যিই যদি থাপ্পড় আমায় কষায় একটা! এই ভিড়ে, সকলের চোখের উপর!

নির্বিকার আমি দাঁড়িয়ে। অমায়িক হাসি মুখে। হারানো শ্লিপগুলির খোঁজে লোকটা গলদঘর্ম, আমিই দায়ী সেজন্যে---তবু তাকে সাহায্যের কোনও রকম চেষ্টা করলাম না। উবু হয়ে ও ঘুর-ঘুর করছে, কলারটা সরে গিয়েছে কাঁধ থেকে—পালক-ছাড়ানো মুরগি যেন! ঘাড় তো নয়—জমাট চর্বির দলা একটা! একটু এগোয় আর খক খক করে কেসে ওঠে হাঁপানি রোগীর মত। লোকটার এই বিদঘুটে চালচলন দেখে আমার হাসি উথলে আসে। ওদিকে শ্রীমতীও নিজেকে যেন সামলাতে পারছে না। ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছে মুখের রঙ। তাকালাম সরাসরি তার মুখের দিকে—অকথ্য ঘৃণা আর বল্গাহারা বিদ্বেষের জ্বালা ফুটিয়ে তুললাম দুই চোখে।

আমি চাইছিলাম, চিরস্থায়ী হোক এই দৃশ্যটা। হারানো বেটিং শ্লিপের সন্ধানে অনন্তকাল ধরে লোকটা এই রকম উবু হয়ে ঘুর-ঘুর করুক—তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি আমি। দেখি এমনি নিস্পৃহ, নির্বিকার, নিরাসক্তভাবে। এক শয়তান যেন আমায় ভর করেছে, আমার গলায় সুড়সুড়ি দিচ্ছে—ঠা ঠা করে আমি হেসে উঠি, এই সে চায়। সাধ জাগছে, হামাগুড়ি-দেওয়া জীবন্ত ওই মাংসের পিণ্ডটাকে হাতের ছড়িটা দিয়ে খোঁচাতে শুরু করি। দেমাকী মেয়েটা একেবারে দমে গিয়েছে, তাই না আমার এত আনন্দ। বিদ্বেষ ভরা এমন অঢেল আনন্দ জীবনে আর কোনদিন পেয়েছি বলে মনে হয় না। ওর হেনেস্থায়, অপমানে আনন্দ আমার অন্তহীন।

লোকটার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল যেন সবগুলো শ্লিপই উদ্ধার করতে পেরেছে। কিন্তু সবগুলো যে নয়—অন্তত একটা যে তার চোখ এড়িয়ে গেছে—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। আমারই পায়ের সামনে নীল রংয়ের শ্লিপ একটি। লোকটাও গুণে দেখল, একটা কম।

এপাশ-ওপাশ উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল, নাক উঁচিয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে তাকাল চারদিকে পিটপিটিয়ে। ওর রকম-সকম দেখে হঠাৎ একটা বদবুদ্ধি মাথা চাড়া দেয়—সন্তর্পণে শ্লিপটা পা দিয়ে মাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম—ভালো মানুষটির মত।

লোকটা ব্বার বার হাতের শ্লিপগুলি গোণে আর আঁতিপাতি করে খোঁজে চারদিক। বেকুব বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে একবার তাকায় আমার দিকে, তারপর উবু হয়ে বসে শুরু করে হামাগুড়ি দেওয়া।

স্ত্রী আর আত্মসম্বরণ করতে পারল না: 'ল্যাজোস!' আচমকা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল। ক্রুদ্ধ স্বরে ডাকল স্বামীকে, চোখ কিন্তু আমার দিকে। চোখের দৃষ্টিতে আমায় যেন ভস্ম করে ফেলতে চায়।

বিউগলের শব্দে ঘোড়ার মত স্ত্রীর ডাকে চমকে উঠল লোকটা। শেষবারের মত চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

এদিকে জুতোর তলা থেকে কাগজের টুকরোটা যেন পায়ে আমার সুড়সুড়ি দিচ্ছে। হাসি চেপে রাখা দুষ্কর হয়ে উঠছে।

লোকটা অসহায়ভাবে তাকাল স্ত্রীর দিকে। স্ত্রী তাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে গেল। মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে।

আর আমি, স্থির হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম নিজের জায়গায়। ওদের অনুসরণের কোন তাগিদ বোধ করছি নে। বলতে গেলে আমার দিক থেকে এই অধ্যায়ের এখানেই ইতি। আমার উত্তেজনা এখন থিতিয়ে এসেছে, মন প্রশান্ত। শয়তানী আমার সার্থক, তারই পরিতৃপ্তিতে প্রাণমন ভরপুর।

কিন্তু, এর পর? এবার আমি কী করি? ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই সাফল্যের সন্তোষে যে মনটা একেবারে নির্জীব, নিষ্প্রাণ হয়ে গেল। তবে কি —তবে কি সব-কিছু শেষ? এরই মধ্যে? এত তাড়াতাড়ি?

সামনে আমার অগণন দর্শক। গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে। অধীর, অধীরতর হয়ে উঠছে উত্তেজনায়। থেকে থেকে জমাট জনতা ঝুঁকে পড়ছে রেলিংয়ের উপর। পড়ুক, যা ইচ্ছে ওরা করুক—রেসের কথা ভাবতেই আমার গা ঘিনঘিন করে ওঠে। থাক ওতে অগাধ অবাধ উত্তেজনা —তবুও রেস দর্শনে কোন তাগিদ পাচ্ছি নে আমি। এর চেয়ে বাড়ি চলে যাওয়া ভালো।

ফিরে যাব বলে পা বাড়িয়েছি, চোখে পড়ে গেল সেই নীল স্লিপটা। ভুলেই গিয়েছিলাম ওটার কথা। স্লিপটা তুলে নিয়ে আঙুল দিয়ে পাকাতে লাগলাম। কী-যে করি এখন এটা নিয়ে! একবার ভাবলাম, যাই, ওই 'ল্যাজোস'-কেই গিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে আসি। ওর গিন্নির সঙ্গে আলাপের একটা চমৎকার সুযোগও তাহলে মিলে যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, মেয়েটা ক্ষেপে গিয়েছে আমার উপর। আমার সম্পর্কে কোন আকর্ষণই ওর নেই আর। আমাকে নিয়ে যে খেলা ও শুরু করেছিল, আমিই তার ইতি টেনে দিয়েছি। ওর সেই কামনার আগুন নিভে এখন ছাই হয়ে গিয়েছে। এদিকে আমারো মধ্যে দেখা দিয়েছে সেই অবসাদ—সমস্ত মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে অবসাদে। ল্যাজোস-গৃহিণীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়ই যথেষ্ট আমার কাছে। কিন্তু ওই রকম একটা লোকের সাথে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে কোন মেয়েকে পেতে হবে! —আমি ভাবতেও পারি নে। কামনার এই ক্ষণস্থায়ী সুড়সুড়িতেই আমার চরমানন্দ। তাইতেই আমি পরম তৃপ্ত।

ওদের খালি চেয়ারটায় বসে পড়লাম। শরীর এলিয়ে দিয়ে সিগারেট ধরালাম। খানিক আগেই জ্বলে ওঠা বাসনার শিখাটি এখন নির্বাপিত। আর আমার কোন কামনা নেই, বাসনা নেই। অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুক্তিতে আর কোন মোহ নেই আমার।

অলস চোখে তাকিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ার দিকে—ছেঁড়া-ছেঁড়া ধোঁয়ার মালা। মনে পড়ছে, মাস ছয়েক আগে মেরানে বেড়াতে গিয়েছিলাম, চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে ছিলাম সেখানকার জলপ্রপাতের সামনে। অবিরাম গর্জন করছিল প্রপাতটি, তবু আমার মনে বারেকের জন্যেও সাড়া জাগাতে পারেনি। আমায় ঘিরে ছিল সবুজ বনভূমি, প্রপাতের নিরবচ্ছিন্ন কল্লোল-ধ্বনি—আর নিস্পৃহ, নির্বিকার, নিরাসক্ত চিত্তে আমি বসে ছিলাম, যেমন এখন রয়েছি, রেসের এই ময়দানে।

রেসের উত্তেজনা ওদিকে ধাপে ধাপে বাড়ছে। টলমল টলমল দূরবিস্তৃত জনসমুদ্র—কালো কালো অগুনতি তরঙ্গ, তরঙ্গে তরঙ্গে ফেনপুঞ্জের মত বিচ্ছুরিত মেয়েলী ছাতা, টুপি, রুমাল। হঠাৎ শত-সহস্র নরনারীর সম্মিলিত চিৎকার অখণ্ড এক নির্ঘোষে পরিণত হল—ক্রেসী! ক্রেসী! ক্রেসী!

তারপর অচমকা নেমে এল স্তব্ধতা, হঠাৎ যেন ছিঁড়ে গেল বেহালার তার।

শুরু হল ফের ব্যাণ্ডের বাজনা। দলে বলে সবাই ফিরে আসছে।

বোর্ডে বিজয়ী ঘোড়াগুলির নাম টাঙিয়ে দেওয়া হল।

আনমনে আমি চোখ তুললাম সেই দিকে। সাত নম্বর হয়েছে প্রথম।

যন্ত্রের মত তাকালাম হাতের শ্লিপটার দিকে।

এরও নম্বর সাত।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড হাসি পেল আমার। ল্যাজোস মশাই তো তা হলে ঠিক ঘোড়াই ধরেছিল! এ কী পরিণাম আমার নিছক কৌতুকের! আহা! মেয়েটার অমন গুণের সোয়ামীকে আমি বঞ্চিত করলাম! এই ভাবে! ভাবতে ভাবতে ফের শয়তানী বুদ্ধি মাথা চাড়া দেয়। আচ্ছা, দেখাই যাক না আমার জন্যে কতখানি ক্ষতি হয়েছে লোকটার? এই প্রথম আমি ভাল করে শ্লিপটা দেখলাম, কুড়ি ক্রাউনের বাজি—'প্লেস' নয়, খেলা হয়েছে 'উইন'-এ একেবারে। 'উইন'-এর খেলোয়াড় যদি বেশি না হয়—সামান্য এই শ্লিপটার বিনিময়ে পাওয়া যাবে প্রচুর অর্থ।

কেমন কৌতূহল জাগল। সবাই ছুটেছে কাউন্টারের দিকে—দলে ভিড়ে গেলাম। যথারীতি কিউ-এ দাঁড়ালাম। একটু একটু করে পৌঁছলাম গিয়ে জানালার সামনে। স্লিপটা বাড়িয়ে দেওয়া মাত্র হাড্ডিসার 'দুটি' হাত (ক্লার্কের মুখখানি নজরে পড়ছে না!) চটপট এগিয়ে এল—স্লিপের বদলে এগিয়ে দিল কুড়ি ক্রাউনের ন'খানা নোট।

অ্যাঁ! সত্যিসত্যিই আমায় তবে টাকা দেওয়া হচ্ছে? নোট-গুলি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার আমার হাসি পেল, প্রচণ্ড হাসিতে দম বন্ধ হয়ে এল। অকথ্য অস্বোয়াস্তিতে মন ভরে গেল। কী সর্বনাশ! এ যে অন্যের প্রাপ্য আমি আত্মসাৎ করছি! থতমত খেয়ে গেলাম, টুক করে সরিয়ে নিলাম হাতটা। নীল নোটগুলো থাকুক ওইখানে, আমি চলে যাই, এই মুহূর্তে আমি পালাই, আর এক দণ্ড এখানে নয়।

কিন্তু আমার পিঠের উপর আরও অনেকে তখন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্লিপ এগিয়ে দিতে শশব্যস্ত—পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকার উপায় নেই। নিলাম নোটগুলি। নিতে হল অগত্যা। নোটগুলি মুঠো করে ধরা মাত্র মনে হল, তালুটা যেন জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে। নীল রঙের এই নোটগুলি যেন নীল নীল আগুনের শিখা কয়েকটি। আমার হাতের মুঠোয় লকলক করছে শিখাগুলি। ভাবলাম, ছুঁড়ে ফেলি—মুহূর্তে নিজেকে মুক্ত করে নিই অসহ এই দহনজ্বালা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ফের সচেতন হয়ে উঠি। সত্যিই যদি নোটগুলি ফেলে দি—কী ভাববে সবাই আমাকে? কী ভাববে সবাই!

সামান্য এক ঠাট্টার এ কী মারাত্মক পরিণাম !

তবু, পরিণাম যাই হোক, এর জের এখন আমায় টানতেই হবে !

আমার মত এক অভিজাত, মার্জিতরুচি, মান্যগণ্য ভদ্রলোকের পক্ষে, রিজার্ভবাহিনীর হোমড়া-চোমড়া এক অফিসারের পক্ষে এমন একটা কাণ্ড করে বসা অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। আমি যা করেছি, অস্বীকার করে লাভ নেই, রীতিমত অন্যায়, অবৈধ। শুধু যে পরের অর্থ আমার মুঠোয় রয়েছে তা নয়—এটা আমি সংগ্রহ করেছি জালিয়াতির সাহায্যে। এককথায়—পরের পাওনা আমি চুরি করেছি !

চারপাশে হট্টগোল। একে একে সবাই জানালার কাছে আসছে, স্লিপ বাড়িয়ে দিচ্ছে—টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে। ছবির মত আমি দাঁড়িয়ে, নোটগুলি হাতের মুঠোয়। কি করবো? কী এখন আমি করতে পারি? ভেবে ভেবে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছি। আমার যেন বোধশক্তি বলে কিছু নেই।

স্বভাবতই প্রথমে মনে হল, আসল লোকটিকে খুঁজে বের করা উচিত আমার। নিজের অন্যায়ের জন্যে করজোড়ে মাপ চেয়ে তার প্রাপ্য তাকে দিয়ে দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু, তাই-বা করি কি করে? আর যাই হোক, ওই অফিসারের সামনে, ওর স্ত্রীর বাবুটির চোখের ওপর একাজ আমি করতে পারি নে। অম্নি চারিদিকে ঢি-ঢি পড়ে যাবে, ভবিষ্যতে লজ্জায় কারো কাছে মুখ দেখাতে পারব না। এমন-কি, রিজার্ভ বাহিনীর লেফটেন্যাণ্ট হিসেবে যে পদমর্যাদা আমার রয়েছে, সেটাও খোয়াতে হবে।

ধরা যাক, শ্লিপটা আমি ইচ্ছে করে জুতোর তলায় লুকোইনি, চলতে চলতে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।

বেশ, ভালো কথা। কিন্তু কুড়িয়ে-পাওয়া শ্লিপ দিয়ে কোন্ আক্কেলে টাকা নিলাম? এটা কি ভদ্রজনোচিত কাজ?—কী অজুহাত দেব?

তার চেয়ে নোটগুলো দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিই। তাই ভালো।

তাই ভালো? এত লোকজনের ভিড়ে ছুঁড়েই বা ফেলব কোথায়? কেউ-না-কেউ নির্ঘাৎ দেখে ফেলবে, সঙ্গে সঙ্গে যা-তা-একটা সন্দেহ করে বসবে।

অথচ নোটগুলি আত্মসাৎ করার কথা আমি ভাবতেও পারিনে। কিম্বা, সুযোগ মত কোন গরীবদুঃখীকে দিয়ে দেব ভেবে ব্যাগে পুরে রাখাও অসম্ভব।

ছেলেবেলা থেকেই টাকাপয়সার ব্যাপারে আমি অত্যন্ত হুঁশিয়ার। পারতপক্ষে ও-সংসর্গে বড় একটা যাইনে। নোংরা জামা গায়ে দিলে যে অস্বস্তিতে দেহমন গুলিয়ে ওঠে, নোটগুলি হাতে করে সেই একই অস্বস্তি এখন জাগছে আমার। এর হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় একটা বার করতেই হবে। এবং, এই মুহূর্তে।

বিভ্রান্ত চোখে অসহায়ের মত চারপাশে তাকাতে লাগলাম—কোথায় এরে লুকিয়ে রাখি নাই যে হেন স্থান।

হঠাৎ নজরে পড়ল, সেই জানালা বরাবর এখন নতুন একটি লাইন তৈরি হয়েছে—একদল লোক ফের কিউ দিয়ে দাঁড়িয়েছ। এদের হাতে বেটিং শ্লিপ নয়, কড়কড়ে নোট। ব্যস! পেয়ে গেছি

আমি মুক্তির উপায়। অকারণে এই টাকা আমার হাতে এসেছে, অকারণেই এটা খরচ করব। ল্যাজোসের স্লিপটা লুকোবার সময় টাকার মোহ আমার ছিল না—এখনও রাখব না। জানালার ওই ক্ষুধার্ত গহ্বর তাড়াতাড়া নোট গলাধঃকরণ করছে—অনেক নোট আর রূপোর মুদ্রা। নতুন বাজির প্রস্তুতি চলেছে। আমারগুলিও সঁপে দেব ওর জঠরে। হ্যাঁ—তাই আমি করব। পরিত্রাণের এছাড়া পথ নেই।

দেহে যেন প্রাণ এল। মনে যেন বল পেলাম। তাড়াতাড়ি লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম। এগিয়ে চললাম।

আমার সামনে আর তুজন মাত্র রয়েছে। প্রথম জন ফোকরে হাত গলিয়ে দিয়েছে—হঠাৎ খেয়াল হল, বাজি যে খেলব একটি ঘোড়ার নামও তো জানিনে!

কান খাড়া করে আশপাশের লোকদের কথাবার্তা শোনবার চেষ্টা করলাম।

কে যেন জিজ্ঞাস করল, 'কি হে—র‍্যাভাশলকে ব্যাক করছ নাকি?'

'তাছাড়া আর কাকেই বা করব?' জবাব এল।

'কেন টেডি? সবচেয়ে বেশি চান্স তো—'

'টেডি? ফুস! এ জন্মেও না! ওটা কোন কম্মের নয়। আমার টিপস্ নাও, বুঝলে—আমার ঘোড়া নির্ঘাৎ—'

উৎকর্ণ হয়ে শুনলাম। টেডি কোন কম্মের নয়? টেডির জেতার কোন চান্স নেই? অল্ রাইট, টেডিকেই তাহলে ব্যাক করব।

নোটগুলি বাড়িয়ে দিলাম। জীবনে যে-ঘোড়াটার নাম এই প্রথম শুনলাম তারই নামে ধরলাম বাজি—প্লেস

নয়, একেবারে উইন। নোটের বদলে এগিয়ে এল লাল শাদা নটি স্লিপ। স্লিপগুলোও হাত পেতে নিতে মন চাইছে না—তবু নোটের মত তালু এখন জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে না। এইটুকুই সান্ত্বনা।

যাক, মুক্তি মিলল এতক্ষণে। বাঁচলাম স্বস্তির শ্বাস ফেলে। ওই নোটগুলোর হাত থেকে রেহাই পেয়েছি, উদ্ধার পেয়েছি আমার সেই মারাত্মক কৌতুকের ভয়াবহ পরিণামের কবল থেকে। ফের আগাগোড়া ব্যাপারটাকে এখন ঠাট্টা বলেই মনে হচ্ছে। অন্তত তাই ভাবতে পারছি।

নিজের চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালাম। খোশ মেজাজে সিগারেটে টান দেই, ধোঁয়ার রিঙ বানিয়ে চলি নতুন উৎসাহে। কিন্তু খানিক পরেই জেগে ওঠে অস্বস্তি। উঠে দাঁড়াই, পায়চারি করি, তারপরে এসে বসি। বসেও শান্তি নেই। কেমন-যেন নার্ভাস হয়ে পড়ছি। মনটা শুধু ছটফট করছে। তবে কি সস্ত্রীক-ওই ল্যাজোসের সঙ্গে নতুন করে দ্বন্দ্বে আমি অবতীর্ণ? ভেবে শিউরে উঠলাম। তাই কি আমার এই অধীরতা?

না না না, তা কি করে হবে? ওরা কি কল্পনাও করতে পারবে—আমার হাতে যে স্লিপগুলি রয়েছে তার আসল মালিক আমি নই—ওরাই?

অস্বস্তি তবু যায় না। লোকজনের ভিড়ের জন্যে এই অস্বস্তি? না। ভিড়ের দিকেই তো তাকিয়ে আছি উৎকণ্ঠিত হয়ে। রেস শুরুর সময় হলে এই ভিড়ের দিকে তাকিয়েই তা টের পাব, তাই কি ওদের প্রতি

অপলক ? কখন শুরু হবে রেস ? কখন ? কতক্ষণে ? বার বার উঠে দাঁড়াই, উঁকি মেরে দেখি ফ্ল্যাগটা উঠল কিনা।

হ্যাঁ, সত্যিই আমি অধৈর্য হয়ে উঠেছি ! সত্যিই আমি প্রত্যাশার জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছি আসন্ন রেসের। যে ঘটনার জের টেনে এলাম এইবার তার সমাপ্তি ঘটবে। এই রেস শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাও হয়ে যাবে শেষ।

হাতে একতাড়া রেস-পত্রিকা নিয়ে একটা হকার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, ইশারায় ডাকলাম। একটি পত্রিকা কিনে চোখ বুলোতে লাগলাম। নানা টিপস্ আর ঘোড়াদের গুণতালিকা আর বংশ-পরিচয়ের অরণ্যে আঁতি-পাতি করে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে টেডির নামটি চোখে পড়ল ? ঘোড়ার মালিক ও জকির নামও। জকির গায়ে থাকবে লাল-শাদা জামা। কিন্তু আমার কী প্রয়োজন অত খুঁটিনাটিতে। এ সব নিয়ে আমি কেন অত মাথা ঘামাই ? হঠাৎ রাগ হয়ে যায় নিজের ওপর। পত্রিকাটি দলামোচড়া করে ছুঁড়ে ফেললাম। উঠে দাঁড়ালাম। আবার বসলাম। ওঠ-বস করতে লাগলাম। সারা শরীরে যেন আগুন ধরে গেছে। ঘামছি দরদর করে। হাতের চেটো দিয়ে কপালটা সাপটে নিলাম। কলারটা একেবারে এঁটে বসেছে গলার সঙ্গে। দম আটকে আসছে। হে ভগবান ! রেস কি আর আরম্ভ হবে না !

অবশেষে শোনা গেল বহুপ্রত্যাশিত সেই ঘণ্টাধ্বনি। জনতা হুড়মুড় করে দৌড় দিল রেলিংয়ের দিকে।

ঘুমঘোরে বিপদের সংকেত শুনে মানুষ যেমন ধরমর করে উঠে পড়ে আচমকা—ঘণ্টাধ্বনিতে আমারও অবস্থা হল অবিকল তেমনি। হঠাৎ চমকে গেলাম, এমনভাবে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম যে উল্টে পড়ে গেল চেয়ারটা। ভ্রূক্ষেপ নেই, আমি হনহন করে এগোচ্ছি। উঁহু—ছুটছি! একে-ওকে ধাক্কা মেরে ভিড়ের মধ্য দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি—শক্ত মুঠোয় ধরে রয়েছি বেটিং স্লিপগুলি। পাছে দেরি হয়ে যায়, পাছে নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু-একটা দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ি—ছুটছি সেই ভয়ে দিশেহারা হয়ে। সামনের লোকজনকে ঠেলে-সরিয়ে পথ করে নিয়ে।

কোন মতে গিয়ে পৌঁছলাম রেলিংয়ের কিনারে। এক ভদ্রমহিলা একটা খালি চেয়ারে বসতে যাচ্ছিলেন, আগেভাগেই আমি গিয়ে সেটায় বসে পড়লাম। অভদ্রের মত।

ভদ্রমহিলা আমার পরিচিত—কাউণ্টেস 'ডব্লিউ'। বিস্মিত, ক্রুদ্ধ চোখে তিনি আমার দিকে তাকালেন। চোখা-চোখি হতেই বুঝলাম উত্তেজনার মাথায় কী ভয়ানক একটা অভদ্রতা করে ফেলেছি।

অভদ্রতা করেছি তো বয়েই গেছে। নিজের লজ্জা ঢাক-বার জন্যে মুখ ফিরিয়ে বসলাম। তাকিয়ে রইলাম রেসকোর্সের দিকে।

ওই—বেশ খানিকটা দূরে—দেখা যাচ্ছে ঘোড়াগুলিকে। অধীর উন্মাদনায় ছটফট করছে, বারবার খালি বেরিয়ে যেতে চাইছে লাইন থেকে। অনেক কষ্টে সামলে রাখছে

জকিরা। পিঠের ওপর বসা জকিদের পুতুলনাচের বিদূষক বলে মনে হয়। হাসি পায় ওদের আকার-আকৃতি দেখে ।

জামার রঙ দেখে দেখে জকিদের চেনবার চেষ্টা করি, কিন্তু এ-ব্যাপারে •একেবারে আনাড়ি আমি। সবকিছু •একাকার হয়ে যায়, লাল-শাদার তফাৎটা পর্যন্ত ধরতে পারিনে।

দ্বিতীয় ঘণ্টাধ্বনি হল। চোখের পলকে—এক ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত রঙবেরঙের সাতটি তীরের মত—ছিটকে বেরিয়ে গেল ঘোড়াগুলি। নিছক সৌন্দর্য উপভোগের আনন্দে যারা এখানে আসে, তাদের কাছে এ একটা দর্শনীয় দৃশ্য বটে। নিরাসক্ত মনে তারা এ-দৃশ্য ছাখে, দেখে মুক্ত বিহঙ্গমের শূন্য-বিহারের কথা তাদের মনে পড়তে পারে। আমি কিন্তু সে-দলে নেই।

আমার নিজের ঘোড়ার, আমার নিজের জকির দিকে শুধু নজর আমার। উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছি, তাকিয়ে রয়েছি বিস্ফারিত করে তুই চোখ। খালি আফসোস হচ্ছে, দূরবীনটা কেন আজ নিয়ে আসি নি! সেজন্যে অভিসম্পাত দিচ্ছি নিজেকে। প্রাণপণ চেষ্টাতেও যে নিজের ঘোড়াটাকে ঠাওর করে উঠতে পারছিনে! মনে হচ্ছে, এক ঝাঁক রঙিন পোকা যেন ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে। একটাকে আরেকটা থেকে আলাদা করা তুষ্কর।

এবার ঝাঁকটার আকার বদলাচ্ছে। বাঁকের মাথায় ওটা কীলকাকৃতি ধারন করল। মুখটি কীলকের মত ধারালো, মূল থেকে তুটি ফ্যাকড়া বেরিয়েছে। শুরু হয়ে গেছে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জোর কদমে প্রায় একসাথে ছুটছে তিন-চারিটি

জানোয়ার—একবার এটা ওকে ছাড়িয়ে ঘাড় বাড়ায়, পরের মুহূর্তে একে পেরিয়ে ওটা। নিজের অজান্তেই আমি সোজা হয়ে দাঁড়াই, গোড়ালিতে ভর দিয়ে উঁকি মারি—ছটফট করি। এই করেই যেন ঘোড়াগুলিকে আমি অতিরিক্ত প্রেরণা যোগাতে পারব। আমার ছটফটানিতেই যেন গতিবেগ ওদের বেড়ে যাবে বহুগুণ।

আশপাশের লোকদের মধ্যেও উত্তেজনা ক্রমবর্ধমান। পাকা রেস্তুড়েরা নিশ্চয় বাঁকের মুখে ঘোড়াদের চিনতে পেরেছে, কেননা তুমুল হট্টগোলের মধ্যেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে বিশেষ এক-একটি ঘোড়ার নাম। আমার পাশেই একজন শূন্যে দু'হাত ছুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে।

একটা ঘোড়া এবার সামান্য একটু এগিয়ে এল, আর তাই দেখে লোকটা গর্জনে ফেটে পড়ল ঃ

'র‍্যাভাশল! র‍্যাভাশল! র‍্যাভাশল!'

এর জকির গায়ে নীল রঙের জামা। আমার ঘোড়া? আমার ঘোড়া তাহলে প্রথমে আসছে না? ক্ষেপে গেলাম আমি। কানের পাশে লোকটা 'র‍্যাভাশল র‍্যাভাশল' করে চেঁচাচ্ছে—কানে যেন আমার গরম সিসে ঢেলে দিচ্ছে। ও যেন সরাসরি আমাকেই অপমান করছে। অকথ্য রাগে হাতটা নিসপিস করে উঠল, ইচ্ছে হল দড়াম করে মুখে ওর দিই একটা ঘুঁষি বসিয়ে। রাগে সর্বশরীর থরথর করতে লাগল। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, আর বুঝি নিজেকে সামলাতে পারব না—এই বুঝি যা-তা একটা কাণ্ড করে বসলাম।

ভাগ্যি ভালো. আরেকটা ঘোড়া ততক্ষণ এগিয়ে এসেছে, র‍্যাভাশলের প্রায় পাশাপাশি। বোধ হয়, এ টেডি। বোধ হয় টেডি—বোধ হয়—বোধ হয়—নতুন উৎসাহে আমি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলাম। ছন্দে ছন্দে দুলছে জকির দুই বাহু—সেইদিকে তাকিয়ে মনে হল, ওর জামার হাতার রঙ যেন লাল। হয়ত লাল। হয়ত কেন, নিশ্চয় লাল। আলবৎ লাল। হতেই হবে লাল। লাল না হয়েই যায় না। হারামজাদা জকিটা কেন চাবুক কষাচ্ছে না? কেন বেপরোয়ার মত চাবকাচ্ছে না ঘোড়াটাকে? জয়ী তো প্রায় হয়েই এসেছে, মাত্র আর ইঞ্চি কয়েক। কয়েক ইঞ্চি মাত্র! র‍্যাভাশল জয়ী হবে? ইস্, হলেই হল! কেন র‍্যাভাশল জয়ী হবে? র‍্যাভাশল! না না, কখ্খনো নয়—র‍্যাভাশল জয়ী হলে চলবে না। র‍্যাভাশলকে জয়ী হতে দেওয়া অসম্ভব। টেডি। টেডি! জয়ী হবে টেডি! সাবাস্ টেডি! সাবাস্! সাবাস! সাবাস! টেডি! টেডি!—

আঁৎকে উঠলাম। এ কী! আমার গলা দিয়ে 'টেডি! টেডি!' বলে কে চিৎকার করে উঠল? আমি?

হ্যাঁ, আমি। আমিই! উত্তেজনার মাথায় আমিই চিৎকার করে উঠেছিলাম। আমি? আমি!

বিমূঢ়-বিভ্রান্ত হয়ে যাই। সঙ্গে সঙ্গে আত্মকর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করি, উত্তেজনাকে ছাপিয়ে ওঠে অপরিসীম লজ্জাবোধ। নিজেকে ধিক্কার দিই বারবার। ছি ছি ছি! শেষে আমিও কি না—।

কিন্তু, সামনে থেকে চোখ ফেরাতে কিছুতেই যে পারছি নে! আপ্রাণ চেষ্টা করেও না। কখনও পাশাপাশি ছুটছে ঘোড়াদুটি

—টেডি, হ্যাঁ টেডিই চেষ্টা করছে র‍্যাভাশলকে মেরে বেড়িয়ে যেতে। টেডিরই চান্স বেশি। টেডি! টেডি! র‍্যাভাশল? জাহান্নমে যাক র‍্যাভাশল!

'টেডি! টেডি! টেডি!'

বিপুল জনতা এবার গর্জে উঠল! শতসহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হতে লাগল ওই একটি নাম। টেডি টেডি টেডি—আকাশ বাতাস থরথর এক নামের উচ্চারণে। জনতার উত্তেজনা আমার মধ্যেও সংক্রামিত। মুহূর্তের জন্যে সচেতন হয়ে উঠেছিলাম, আবার হয়ে গেলাম দিশেহারা। টেডি! টেডি! জিততেই হবে টেডিকে। টেডিকেই জিততে হবে। এখন ও বিঘৎখানেক এগিয়ে এসেছে। না না, আবার দুটো ঘোড়া পাশাপাশি হয়ে গেল। আবার—ফের টেডি এগিয়ে গেছে—তাই কি? তাই কি? তবে কি—?

হঠাৎ ঘণ্টাধ্বনি হল। আনন্দ আর হতাশা, ক্রোধ ও বিষাদের প্রচণ্ড বিস্ফোরণে গমগম করে উঠল চারদিক। কারা যেন রাজ্য জয় করেছে, কারা হারিয়েছে সর্বস্ব।

ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে এল হট্টগোল—কোথা থেকে যেন ভেসে এল যন্ত্রসঙ্গীতের সুরলহরী।

শরীর আমার গরম হয়ে উঠেছে। ঘামে জবজবে হয়ে গিয়েছি। দপদপ করছে কপালের রগ, শিরাগুলো ফেটে পড়তে চাইছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম—মাথা ঘুরে উঠল, আবার বসে পড়লাম। বসে রইলাম খানিকক্ষণ। অজ্ঞাত-পূর্ব একটা আনন্দের বন্যায় অভিভূত।

অর্থহীন, নির্বোধ এই আনন্দ। ভাগ্যকে আমি চ্যালেঞ্জ

করেছিলাম, এ তারই পুরস্কার। পুরস্কার? হায়রে পুরস্কার! এই পুরস্কার পেয়েই আমি খুশী হয়ে উঠেছি আহাম্মকের মত! মনকে বোঝাবার চেষ্টা করি, ও ঘোড়া জিতুক আমি তো চাই নি। বিশ্বাস করো, সত্যিই তা চাই নি আমি। টাকাগুলো জলে যাক, এই ছিল আমার একমাত্র কামনা আন্তরিক প্রার্থনা। যে-করেই হোক ওই টাকাগুলোর হাত থেকে আমি শুধু রেহাই পেতে চেয়েছিলাম।—বৃথা চেষ্টা। মন অবুঝ, বোঝে না। বরং দেখতে দেখতে আরেকটা বাসনা তার মধ্যে জেগে উঠল, মুঠো করে ধরল মনের লাগাম। কে যেন হাত ধরে আমায় বিশেষ একদিকে টেনে নিয়ে চলেছে। বিশেষ একদিকে! জানি কোনদিকে! এবং কেন।—আমার বিজয়ের পুরস্কারের পরিমাণটা স্বচক্ষে আমি দেখতে চাই। হাত পেতে নিতে চাই আমার জয়ের গৌরব। হাতের তালু দিয়ে অনুভব করতে চাই নোটগুলির স্পর্শ। একতাড়া নোট! আঙুল দিয়ে মুঠো করে ধরতে চাই সেইগুলি! কান পেতে শুনতে চাই তার খসখসে আওয়াজ।

সম্পূর্ণ নতুন, অভিনব, আর অশুভ একটা লালসা আমায় পেয়ে বসেছে। আর লজ্জার বালাই নেই, এর হাত থেকে রেহাই পাবার ইচ্ছেও নয়।

ছুটতে ছুটতে গিয়ে হাজির হলাম কাউন্টারের সামনে। লাইনের দিকে না তাকিয়ে, ভদ্রতার পরোয়া না করে, একে-ওকে কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে ঠেলে-সরিয়ে চেষ্টা করলাম এগিয়ে যাবার। সবুর সইছে না! আর এক মুহূর্ত দেরি করলে আমার চলবে না। টাকা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। এক লহমা এদিক-ওদিক হলেই যেন ওটা যাবে তামাদি হয়ে।

'কী অসভ্য!' বিড় বিড় করে উঠল একজন। শুনেও শুনলাম না। অপমানের প্রতিকার করবার ফুর্সৎ নেই। টাকা! টাকা! টাকার জন্যে আমি অধৈর্য, দিগ্বিদিক জ্ঞান-হীন। অবশেষে পৌঁছলাম গিয়ে জানালার কাছে। আমার আঙুলগুলো লোলুপভাবে আঁকড়ে ধরল নীল রঙের নোট এক গোছা। থরথর হাতে গুণতে শুরু করে দিলাম। ছ' শ চল্লিশ ক্রাউন—আমার জয়ের মূল্য। নোটের বাণ্ডিল নিয়েই লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলাম। পালিয়ে এলাম জানালার কিনার থেকে।

খেলব নাকি আবার? ফের যদি জিতি--জিতবই—এর পরিমাণ তাহলে বেড়ে যাবে অনেকগুণ। কী মুশকিল! সেই রেস-পত্রিকাটা গেল কোথায়? এই ছ্যাখ! নিজেই না সেটা তখন ফেলে দিলাম।

হকারটার খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম। আরেকটা কিনতে হয়। কিনতেই হবে।—হকার, হকার!

হঠাৎ খেয়াল হল, লোকজন সব বেরিয়ে যাচ্ছে, কাউণ্টারের জানালা বন্ধ, গুটিয়ে ফেলা হচ্ছে পতাকাগুলি। দেখে একেবারে বেকুব হয়ে গেলাম। আজকের মত রেস তবে শেষ হয়ে গেল!

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কয়েক সেকেণ্ড!

তার পরেই হিংস্র রাগে গায়ে জ্বালা ধরে গেল—অন্যায়! এ ঘোরতর অন্যায়! অনেক দিন, অনেক সপ্তাহ, অনেক মাস, অনেক-অনেক বছর পরে আজ প্রথম আমার প্রত্যেকটি স্নায়ু যখন নতুন প্রাণ-প্রেরণায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, শিরায় শিরায় উদ্দাম যখন রক্তস্রোত—তখন কিনা খেলাটা শেষ হয়ে গেল

এমন আচমকা ? যে-খেলাকে কেন্দ্র করে এতকাল পরে আমার মরা গাঙে নব-জীবনের জোয়ার আসছিল—এরি মধ্যে ঘটল তার সমাপ্তি ? এ অসহ্য ! অন্যায়—ভয়ানক অবিচার। নিশ্চয় আমি ভুল করেছি। নিশ্চয় আবার রেস শুরু হবে। নিশ্চয় হবে !

কিন্তু মিছেই মনকে প্রবোধ দেওয়া। ভিড় ক্রমেই পাতলা হচ্ছে। বিরাট মাঠের এখানে-ওখানে কয়েকজন শুধু এখন পায়চারি করছে।

না, প্রত্যাশা পূরণের কোন আশা নেই আর।

অগত্যা ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম গেটের দিকে। পরিচারক শ্রেণীর একটা লোক সামনে এসে সেলাম করে দাঁড়াল। আমার ঘোড়ার গাড়ির নম্বরটা তার হাতে দিলাম। হাত পেতে কাগজের টুকরোটা সে গ্রহণ করল। একটু পরেই গাড়ি নিয়ে হাজির গাড়োয়ান। উঠলাম। বড় রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে বললাম।

উত্তেজনা থিতিয়ে আসছে। তার জায়গায় জেগে উঠছে অবসাদ। অস্বস্তি নেই এই অবসাদে, আছে পরিতোষ। পরিতোষ ? হয়ত। শরীর এলিয়ে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনাটা রোমন্থন করতে শুরু করে দিলাম।

পাশ দিয়ে একটা গাড়ি বেরিয়ে গেল। আপনা হতেই চোখ পড়ে গিয়েছিল, চমকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। গাড়িতে রয়েছে সেই স্ত্রীলোকটি, পাশে স্বামী-পুঙ্গব। আমায় ওরা দেখে নি। না দেখুক, কিন্তু ওদের দেখেই আমি শিউরে উঠলাম। ওদের ক্ষণিক সান্নিধ্যে মন ভরে গেল অকথ্য অস্বস্তিতে।

অন্যান্য গাড়ির সঙ্গে লাইন বেঁধে মন্থর গতিতে চলেছে আমার গাড়ি। রবারের চাকা বলে বেশি শব্দ হচ্ছে না। মেয়েরা রয়েছে ওই সব গাড়িতে। তাদের উজ্জ্বলরঙ পোশাকের ঝলমলানি দেখে মনে হয় : গাড়িগুলো যেন ফুল দিয়ে সাজানো একেকটি নৌকা আর এই রাস্তা যেন সংকীর্ণ এক বহতা নদী, দুপাশে চেস্টনাটের সার—সবুজ পাড়। নৌকাবিহারে যেন বেরিয়েছে সবাই। সন্ধ্যার শীতল সমীরণে না জানি কিসের সুবাস। কী মনোরম পরিবেশ!

হোক মনোরম, তবু মনে আমি স্বস্তি পাচ্ছি নে। ওই লোকটাকে দেখেই আমার সমস্ত উৎসাহে অকস্মাৎ ভাঁটা পড়ে গিয়েছে। ওকে আমি প্রতারণা করেছি—থেকে থেকে খালি মনে হচ্ছে সেকথা। ওকে আমি প্রতারণা করেছি! ওকে আমি প্রতারণা করেছি!

সোজা হয়ে বসলাম। চেষ্টা করলাম আমার কাজটাকে আনুপূর্বিক পর্যালোচনা করে দেখবার—যুক্তি দিয়ে, বিচারবুদ্ধির সাহায্যে।

কিন্তু, কোন অজুহাত খুঁজে পাচ্ছি নে। মান্যগণ্য একজন অফিসার হয়ে, শিক্ষিত ভদ্রসন্তান হয়ে এ কী আমি করে বসলাম! অর্থের অভাব তো আমার ছিল না, তবু অন্যের প্রাপ্য আত্মসাৎ করলাম! করলাম এমন সুকৌশলে ও সচেতন ভাবে যে এর মার্জনা পর্যন্ত নেই। কোনরকম বাকচাতুরি দিয়ে ঢাকা একে যাবে না। মাত্র কয়েকঘণ্টা আগেই ফিটফাট এক ভদ্রলোক বলে পরিচিত ছিলাম, নিখুঁত এক ভদ্রলোক—আর এখন?

চোর। কার্যত এখন চোর ছাড়া কিছু নই আমি। চোর!

নিজেকে ভয় দেখাবার জন্যে, ঘোড়ার কদমের তালে তালে, বিড় বিড় করে আমি বলতে লাগলাম, 'তুমি চোর! তুমি চোর! তুমি চোর!'

আমার সে-মানসিক অবস্থার বর্ণনা দেব কি করে? সে-সাধ্য আমার নেই। সে এক অবর্ণনীয় অবস্থা। আজও, এতদিন পরেও—সে-কথা স্পষ্ট আমার মনে রয়েছে। সেদিনের সেই আমিকে চোখের সামনে এখনো দেখতে পাচ্ছি। আমার তখনকার সেই অনুভূতির প্রতিটি মুহূর্ত, চিন্তাভাবনার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জ্বলজ্বল করছে চোখের উপর। কী-এক অলৌকিক শক্তির প্রেরণায় আমার স্মৃতির পটে আজো সেটা অক্ষয় হয়ে রয়েছে! পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হল, কিন্তু এতখানি স্পষ্টভাবে জীবনের আর-কোন ঘটনার কথাই মনে পড়ে না।

তবু হাত কাঁপে সে-কথা লিখতে গেলে, স্তব্ধ হয়ে যায় লেখনীর গতি। আমার চেতনার সেই উত্তাল আলোড়নের অবিকল ছবি কালির আখরে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব। হয়ত কল্পনা-বিশারদ কোন লেখক কিম্বা শক্তিমান মনস্তাত্ত্বিক একাজে সক্ষম হতেন—আমি অন্তত নই। আমি শুধু পারি ঘটনাবলীর শাদা-মাঠা একটা বিবরণ দিয়ে যেতে। তার বেশি আমার সাধ্য নেই।

'তুমি চোর! তুমি চোর! তুমি চোর'—বিড়বিড় করে শুধু এই কথাগুলি নিজেকে আমি বলছিলাম বারবার। অভিশাপ দিচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎ ঘটল বিরতি—হঠাৎ যেন শূন্য হয়ে গেল সবকিছু। শূন্য! শূন্য! চারপাশ থমথম করতে লাগল। স্তব্ধ, গম্ভীর। উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম। কি বলতে চায় এখন মন আমার? কোন্ কৈফিয়ৎ সে দেবে এবার?—দম বন্ধ করে

রইলাম। শুনতে হবে মনের-গভীর গহন থেকে উচ্চারিত হয় কোন্ জবাব। নিজেকে আমি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছি, এখন জবানবন্দী দেবার পালা।

কান পেতে রইলাম, প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে একটি ইন্দ্রিয়কে শুধু উগ্র করে তুললাম।

কিন্তু, কোন জবাব নেই। কোনও কৈফিয়ৎ না।

আশা করেছিলাম, চোর অপবাদের চাবুকে সত্তা আমার শিউরে উঠবে, লজ্জায় আমাকে অভিভূত করে দেবে।

হায়! শিউরে সে বারেকের তরেও উঠল না! লজ্জা সে এতটুকুও বোধ করল না!

তবু, ধৈর্য ধরে তবু আমি প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। আরো মিনিট কয়েক প্রত্যাশায় রইলাম। নিজেই নিজের ওপর ঝুঁকে পড়লাম, যাতে স্পষ্ট করে শুনতে পাই আমার আত্মার কৈফিয়ৎ (কেননা আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে এই রহস্যনিবিড় মৌনতার মানে একটা নিশ্চয় রয়েছে)। জ্বরো রুগীর মত আমি প্রতীক্ষা করছি আমার এই মারাত্মক অভিযোগের জবাবের। এই বুঝি ঘৃণা ও লজ্জা, বিষাদ আর হতাশায় ভরা একটি করুণ আর্তি ধ্বনিত হয়ে ওঠে। এই বুঝি ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে মনটা।

হায়! কেঁদে সে উঠল না। জবাব সে দিল না। সামান্য একটা অজুহাতও নয়।

'তুমি চোর! তুমি চোর! তুমি চোর!' পুনরুক্তি করলাম আমার অভিযোগ। এবার আরো জোরে, স্পষ্টতর স্বরে। এই ভাবে ঘা দিয়ে দিয়ে যদি জাগাতে পারি বধির বিবেককে।

হায়! তবু সে জাগল না। এত করেও সাড়া তার পেলাম না।

হঠাৎ, বিদ্যুৎ-চমকের মত, মনে হল—এই যে এতক্ষণ ধরে লজ্জিত হবার এত চেষ্টা করছি, তবু কই—নামমাত্র লজ্জাও তো বোধ করছি নে? লজ্জাশরম দূরে থাক, নিজের কুকীর্তির জন্যে মনের গোপনে বরং একটা অহমিকার ভাবই জেগে উঠেছে। গৌরব অনুভব করছি নিজের বাহাদুরির কথা ভেবে।

কেন? কেন এমন হল? কি করে এ সম্ভব হয়? নিজেকে আমি ভয় পাচ্ছি? তাই কি ওই অবাঞ্ছনীয় চিন্তাটার হাত এড়াতে চাইছি এই ভাবে? তাই কি?

জানি নে, বলতে পারব না—আমার তখনকার মানসিক অবস্থা বর্ণনা করা অসম্ভব। দুরন্ত একটা আবেগের বন্যা মনের মধ্যে ফুঁসে উঠেছে। ঘৃণা, লজ্জা বা অনুশোচনা—কিছুই বোধ করছি নে। সে-আবেগে আছে আনন্দ একধরনের। আনন্দের উগ্র নেশা। সেই নেশার শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে আমার মধ্যে। মনে পড়ছে—কিছুক্ষণের জন্যে সত্যি করে আমি আজ বেঁচে উঠেছিলাম—অনেকদিন, অনেক সপ্তাহ, অনেক মাস, অনেক বছর পরে। তাহলে একেবারে মৃত আমি নই? মৃতকল্প শুধু? পক্ষাঘাতে আমার সমস্ত অনুভূতি অচল-অবশ হয়ে গিয়েছিল মাত্র? নইলে আমিও বেঁচে আছি? বেঁচে আছি আমি?

নিজেকে চিনলাম, খুশীতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলাম। আমার চেতনার তেপান্তরে—নিরাসক্তির অন্তরালেও—রয়েছে কামনার এক ঘুমন্ত অগ্নিগিরি! ঘুমন্ত, মৃত নয়। আজ এখন, এই

অপরাহ্ণে, দৈবের যাদুছোঁয়ায় সে জেগে উঠেছে, শুরু হয়ে গেছে তার লাভা উদ্গার। আমি মানুষ। সমগ্র মানবজাতির অতি-ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ আমি। আমার মধ্যে, আমার মধ্যেও রয়েছে মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তি। মানুষের স্বাভাবিক সহজাত রহস্য-ময় সেই অনির্বাণ অগ্নিশিখার অধিকারী আমিও। থেকে থেকে কামনা-বাসনার প্রবল সংঘাতে সেই শিখা লেলিহান হয়ে ওঠে। লোভ আর লালসা বুকে নিয়ে আমিও বেঁচে উঠি—বাঁচতে পারি।

বাসনার ঝড়োহাওয়ায় খুলে গেছে এক রুদ্ধ কপাট, কী-এক বন্যার তোড়ে অসহায়ের মত ভেসে চলেছি। মাথা ঝিমঝিম। শূন্য দৃষ্টি মেলে দিলাম দূরান্তে, দূরদিগন্তে। আনন্দ আর আতঙ্কের মিশ্র আবেগে মন উদ্ভ্রান্ত।

তুলকি চালে এগিয়ে চলেছে গাড়ি, তারই তালে তালে পা ফেলে আমি অবরোহণ করছি আমার আত্মার গভীরে। হাতে আমার নবজাগ্রত বিবেকের দীপ্ত দীপশলাকা। তার আলোয় পথ চিনে চিনে আপন আত্মার অভিসারে চলেছি। চলেছি নিঃসঙ্গ, একক দাঁড়াতে হবে তার মুখোমুখি।

পরিবেশ স্তব্ধ, গম্ভীর।

আমার চার পাশে হাজার হাজার লোক হাসছে, গাইছে, অবাধ আনন্দে মাতোয়ারা তারা। সেদিকে আমার ভ্রূক্ষেপ নেই।

আমার অন্তরের আরেক আমি-কে খুঁজে এখন আমায় বের করতেই হবে—আমার সেই হারিয়ে-যাওয়া আমি-কে। খুলে গিয়েছে অতীতের রুদ্ধদুয়ার, অপসারিত বিস্মৃতির যবনিকা! কত কথা মনে পড়েছে, কত ছবি মনে ভেসে উঠেছে। ইশ্‌কুলে পড়বার

সময় একবার কোন্ সতীর্থের পেন্সিল-কাটা ছুরিটা চুরি করেছিলাম। ছুরি হারিয়ে ছেলেটা পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল, প্রত্যেকের হাতে-পায়ে ধরেছিল, জিজ্ঞেস করেছিল কেউ কি দেখেছে তার সাধের ছুরিটি। বেচারা! জ্বলজ্বল করছে সেই ছবি —একপাশে দাঁড়িয়ে মনে মনে আমি হাসছিলাম। শয়তানি খুশীতে মন আমার ভরে গিয়েছিল।

অবিকল আজকের এই অপরাহ্নের মত!

অদ্ভুত একটা আবেগের আলোড়ন অনুভব করছি। কী আশ্চর্য! আমিও একদা প্রেমে পড়েছিলাম! আমিও একদিন দেহে-মনে অনুভব করেছিলাম বাসনার দাবদাহ! মনে পড়ছে। একে একে মনে পড়ছে হারানো অতীতের অনেক স্মৃতি, কত না রোমাঞ্চকর অনুভূতি। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, কৃত্রিম সামাজিক পরিবেশের, তথাকথিত আভিজাত্যের, লোক-দেখানো ভদ্রতার চাপে, আমার কামনা-বাসনা সাধ-আহ্লাদ বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল সত্যি, কিন্তু মরে একেবারে যায় নি। লুকিয়ে ছিল মনের গভীরে —আর-আর মানুষের মত আমারও ছিল মানবিক হৃদয়বৃত্তি। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত তা বয়ে চলেছিল—জীবন-প্রবাহের সাথে সাথে। হ্যাঁ, আমিও একদিন বেঁচে ছিলাম। বেঁচে ছিলাম? হ্যাঁ, বেঁচে ছিলাম। তবু সাহস করে সে কথা ঘোষণা করতে পারি নি। অদৃশ্য এক শৃঙ্খলে আমি বেঁধে রেখেছিলাম নিজেকে, নিজেকে আড়াল করে রেখেছিলাম নিজের কাছ থেকে। সেই শৃঙ্খল আজ ছিন্ন, আড়ালের বাধা নিশ্চিহ্ন—মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আমার চাপা-পড়া প্রাণশক্তি। জীবন জাগছে, নবজীবনের জোয়ার এসেছে। নিজের জঠরে

আর-এক আগন্তুকের, নতুন এক প্রাণের, আবির্ভাব উপলব্ধি করার সাথে সাথে যে অনির্বচনীয় বিস্ময়ে ভরে ওঠে জননীর হৃদয়-মন, সেই একই বিস্ময় আমারো। আমিও অনুভব (এই শব্দটি ব্যবহার করতে কেমন-যেন লজ্জা হচ্ছে) করছি মুমূর্ষু একটি মানুষ ধীরে ধীরে উজ্জীবিত হয়ে উঠছে। চলমান জীবন থেকে সে হারিয়ে গিয়েছিল, পিছিয়ে পড়েছিল—এখন আবার নতুন করে আবির্ভূত হচ্ছে। অনুভব করছি আমার শিরায় শিরায় উদ্দাম রক্তস্রোতের কলকল্লোল। আমি জাগছি, জেগে উঠছি। নতুন প্রাণবীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে আমার মধ্যে। এর পর সে পত্রে-পুষ্পে বিকশিত হয়ে উঠবে। ফল ধরবে! হয়ত সে ফলের স্বাদ হবে মধুর, হয়ত-বা কটুকষায়—কে জানে। কী দরকার জানার!

চলমান একটা গাড়ি থেকে কে যেন আমায় ডাকল, আমার নাম ধরে চিৎকার করে উঠল। হয়ত প্রথমে সে আমায় নমস্কার জানিয়েছিল নিঃশব্দে, দেখতে পাই নি। তাই এবার চেঁচিয়ে উঠেছে। তার ডাকে আমি চটে গেলাম। কেন ও ভেঙে দিল আমার তন্ময়তা? কত দিন, কত দীর্ঘ-দীর্ঘ দিন পরে নিজেকে ফিরে পেয়েছিলাম, নিজেকে নিয়ে আত্মগত হয়ে পড়েছিলাম—কেন ও এমন করে বাদ সাধল! আগুন-ঝরা চোখে তাকালাম লোকটার দিকে, তাকিয়ে মনে পড়ে গেল আমারই কথা। অতি সাধারণ, সকলের পরিচিত যে-আমি—তার কথা। ও যে আমার সেই-আমারই প্রাণের বন্ধু—এ্যালফন্‌স্। একসাথে ইশ্‌কুলে পড়েছি, গলায় গলায় ভাব ছিল। আজ ও পাবলিক প্রসিকিউটার—সরকারি উকিল।

হঠাৎ মন বলল, এমন হাসি-হাসি মুখে যে তোমায় নমস্কার জানাল, হুঁশিয়ার, সে কিন্তু তোমার চেয়েও শক্তিমান। একবার তোমার কীর্তির কথা ও যদি টের পায়, আর রক্ষা নেই। ওরই দয়ার মুখ চেয়ে তোমায় তখন থাকতে হবে। সে-কথা জানার সঙ্গে সঙ্গে ওর কর্তব্য হবে গাড়ি থেকে তোমায় টেনে নামানো। তোমার এত সাধের স্বপ্ন-রোমন্থনের ইতি ঘটিয়ে তোমায় নিয়ে গিয়ে ও জেলে পুরবে। তারপর বছর কয়েকের জন্যে তোমায় টানতে হবে জেলের ঘানি, থাকতে হবে অতি ছোটলোক সব কয়েদীদের সাথে—নেহাৎ প্রয়োজনের তাড়নায় চুরি-চামারি করে যারা জেলে এসেছে।

কথাটা মনে হতেই একটা অস্বস্তি জেগে ওঠে। ক্ষণিক অস্বস্তি। মোড় ঘুরে যায় মনের—অদ্ভুত একটা গর্বে, অলীক এক অহমিকায় মন ভরে ওঠে। বন্ধুর চলার পথের দিকে তাকালাম বেপরোয়া ভাবে, মনোজগতের সকলকে যেন শুনিয়ে শুনিয়ে অবজ্ঞাভরে মনে মনে বললাম, 'হায় বন্ধু! জানি, আমার কীর্তি যদি টের পেতে—তোমার ওই ঠোঁটের হাসি ঠোঁটেই শুকিয়ে যেত, সঙ্গে উঠে পড়ে তুমি ডিউটি তামিল করতে লেগে যেতে। জানি, বন্ধু, জানি। কিন্তু নাগাল আমার আর তুমি পাবে না, বন্ধু। আজই বিকেলে তোমাদের ছকেবাঁধা জীবনের ঘেরাটোপ ভেঙে আমি বেরিয়ে পড়েছি। গতানুগতিক তোমাদের পৃথিবীতে গতানুগতিক ভাবেই এতকাল আমি জীবন কাটাচ্ছিলাম, সদাঘূর্ণমান সেই পৃথিবীরই এক অচ্ছেদ্য অংশ ছিলাম। অচ্ছেদ্য, অলস। নিষ্ক্রিয়, নিঃশব্দ। মুখ ফুটে কোনদিন প্রতিবাদ জানাই নি, মুখ বুঁজে প্রতিদিন সব

সয়ে গিয়েছি। আজ আর ওই পৃথিবীর কেউ নই আমি। বরং তোমাদের সাহচর্যে, তোমাদের নিস্তরঙ্গ জীবনের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বছরের পর বছর বাস করেও যে অনুভতির কণামাত্র আস্বাদও কখনও পাই নি—আজকের এই মুহূর্তে তার চেয়ে অনেক জোরালো, প্রবলতরো একটা অনুভূতি আমার মনের অতল থেকে ঘাই মারছে। এই এক ঘণ্টা যেমন পরিপূর্ণ ভাবে আমি বাঁচছি, পূর্ণাঙ্গ জীবনের যতখানি পরিচয় পাচ্ছি—সারা জীবনেও তা পাই নি। আর আমি তোমাদের কেউ নই, বন্ধু। তোমাদের ওই বাঁধাধরা জীবনের সাথে আর কোন সম্পর্ক নেই আমার। তোমাদের চেয়ে অনেক উপরে আমি উঠে যেতে পারি, কিম্বা নেমে যেতে পারি অনেক নিচে—তবু তোমাদের দলে ফিরে যাব না। তোমাদের আয়েসী জীবনের বন্ধ্যা মাটিতে আর দাঁড়াব না। নির্বোধের নিরাপদ কোটরে নিজেকে লুকিয়ে আর রাখব না। কেন? কারণ, ভালো হোক, মন্দ হোক কাজ করার মধ্যেও যে কী রোমাঞ্চ শিহরণ রয়েছে, আজই আমি তা প্রথম উপলব্ধি করলাম। বন্ধু, তোমরা একথা বুঝবে না, আমার মনের হদিশ পাওয়ার সাধ্য তোমাদের নেই। আমার এই রহস্যের সোনার কাঠির সন্ধান তোমরা জীবনে পাবে না, বন্ধু, কোনও-দিনও না।'

বাইরে যথারীতি ফ্যাশানদুরস্ত থেকে, জাতভাইদের সঙ্গে যথারীতি অভিবাদন বিনিময় করতে করতেও এই সব কথা আমি ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, কিন্তু সে-ভাবনার হুবহু বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। এতখানি লিপিচাতুর্য আমার নেই। একদিকে আমি, সকলের পরিচিত এই-আমি—সকলের সঙ্গে ভদ্রতার ঠাঁট বজায় রেখে চলেছি, কারো সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র ঘাড় নাড়ছি,

নমস্কার জানাচ্ছি, নমস্কার-বিনিময় করছি—আর সেই সঙ্গে আমার ভিতর থেকে এক মদির সুরলহরী ঝঙ্কৃত হয়ে উঠছে, প্রচণ্ড বিস্ফোরণে যেন ফেটে পড়তে চাইছে,—প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে রাখছি, পাছে আনন্দের আতিশয্যে কণ্ঠ আমার প্রতিধ্বনি তোলে সেই সুর-ঝঙ্কারের। রুদ্ধমুখ উত্তাল আবেগের বিক্ষোভে কী-যে শারীরিক যন্ত্রণা! হাওয়ার অভাবে বুকটা যেন চৌচির হয়ে যাবে—দুহাতে বুক চেপে ধরলাম। যন্ত্রণা! অসহনীয় যন্ত্রণা!

শুধুই যন্ত্রণা? না, যন্ত্রণা আর আনন্দ। আর আতঙ্ক। আতঙ্ক আর বিরক্তি—সব মিলে-মিশে একাকার। একটি থেকে আরেকটিকে আলাদা করবার উপায় নেই। একসুরে বাঁধা হয়ে গেছে অনেকগুলি তার। বেজে উঠছে একটি রাগিণী ঃ আমি বেঁচে আছি! আমি বেঁচে আছি! আমি বেঁচে আছি! এটাই মানুষের আদিমতম অনুভূতি। ভগবান! কত বছর এ থেকে আমি বঞ্চিত ছিলাম!

কত বছর!

উগ্র সুরার মত এই অনুভূতি আমায় এখন মাতাল করে তুলেছে। পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে একটি দিনের তরেও বেঁচে থাকার এমন অবর্ণনীয় আনন্দ, এমন হৃদয়-দেহ-মন মাতাল-করা আনন্দের বন্যা আমি অনুভব করি নি!

বেঁচে থাকা এত আনন্দের!

কোচোয়ান লাগাম টেনে ধরল, ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল গাড়িটা। নিজের আসন থেকেই মুখ ফিরিয়ে সে জানতে চাইল—আমি এখন বাড়ি ফিরে যাব কিনা?

সচেতন হয়ে উঠলাম। তাকালাম চারপাশে। আশ্চর্য! আমি কি এতক্ষণ ধরে স্বপ্ন দেখছিলাম? স্বপ্নের জগতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম? শেষ-বিকেলের আলোটুকু মুছে-গিয়ে কখন রাতের আঁধার নেমে এসেছে, টের পাই নি। হাওয়ার ছোঁয়ায় গাছের পাতারা কথা কইছে ফিসফিস স্বরে—মৃদু-মর্মর ধ্বনি। সদ্য-ফোটা চেস্টনাটের সৌরভমদির সন্ধ্যার সমীরণ। গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে রূপোলি চাঁদের লুকোচুরি। অসম্ভব এখন বাড়ি ফিরে যাওয়া। অতিপরিচিত পুরনো পৃথিবীর দৈনান্দৈনিক গতানুগতিকতায় প্রত্যাবর্তন—অসম্ভব এখন। ভাড়া চুকিয়ে দেওয়ার জন্যে মনিব্যাগ বার করলাম।

ব্যাগের মধ্যে হাত ঢোকানোর সাথে সাথে যেন বিদ্যুতের শক লাগে : সেই নোটগুলি! থরথর করে উঠল হাত। কেন উঠল? কেন—কেন এই দ্বিধা, দ্বন্দ্ব? হায়! এখনো যে রয়ে গিয়েছে সততাবোধের অবশেষ, ন্যায়পরায়ণতার জের। এখনও যে মন লজ্জা পায়! আমার ভদ্রতাবোধের মুমূর্ষু বিবেক এখনো একেবারে মরে যায় নি। কিন্তু তবু, অপহৃত এই অর্থের ছোঁয়ায় আনন্দের অনুভূতিও অনুপস্থিত নয়। কৃপণের মত রসিয়ে রসিয়ে সে আনন্দ আমি উপভোগ করব।

অপ্রত্যাশিত প্রাপ্য পেয়ে কোচোয়ান খুশীতে অপ্রস্তুত। আমার উদারতার জন্যে বারবার ধন্যবাদ জানাতে লাগল।

না হেসে আমি পারলাম না : 'হায়, তুমি যদি জানতে! যদি জানতে কোথায় উৎস এই উদারতার!'

ঘোড়া দাবড়িয়ে গাড়ি নিয়ে সে চলে গেল, তাকিয়ে রইলাম : যেন দাঁড়িয়ে রয়েছি জাহাজে, তীরভূমি দূরে সরে যাচ্ছে, ক্রমেই

দূর থেকে দূরে। কত না খুশীয়ালি দিন কাটিয়েছি ওখানে, ওই মাটির পৃথিবীতে—সমুদ্রে পাড়ি দেবার সময় সেই সব স্মৃতি মনে ভিড় করে আসছে।

তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। মোহাচ্ছন্নের মত। তারপর 'সাচের গার্ডেনের' দিকে এগোলাম। রোজ বেড়িয়ে ফেরার পথে ওখানেই রাত্রির আহার-পর্ব শেষ করি—কোচোয়ান জানে, জানে বলেই এখানে এসে থেমেছিল।

কিন্তু—।

অত্যাধুনিক মুক্তবায়ু রেস্তোরাটার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম। না, পরিচিত পরিবেশে আর আমি ফিরে যেতে চাই নে। সামাজিক সমধর্মীদের অলস বিশ্রম্ভালাপে খানখান হয়ে যাবে আমার এই মানসিক প্রশান্তি, রহস্যনিবিড় এই মনোপরিমণ্ডল। ওরা আমায় রূঢ়বাস্তব পৃথিবীতে টেনে নামাবে—যে সাধের স্বপ্নসৌধ আমি নির্মাণ করে তুলেছি আজকের মায়াবী অপরাহ্ণে, ওদের সাহচর্যে সেটা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে মুহূর্তে। না না, ওদের মাঝে ফিরে যেতে আমি চাই নে। ফিরে আমি যাব না।

বহু দূর থেকে ভেসে আসছে সঙ্গীতের সুর। মাদকতাময় সেই সুরের ঝঙ্কারে মন সাড়া দিয়ে ওঠে। মাদকতাময় সবকিছুতেই মন আজ আমার সাড়া দিচ্ছে। মনের হাতে নিজেকে সঁপে দিলাম, এগোলাম।

ভিড় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলি, চলেছি জনতার একজন হয়ে। এগিয়ে চলেছি। কী ভালোই যে লাগছে! পথের ধূলো আর সস্তা সিগারেটের ধোঁয়া, ঘামের গন্ধ আর

শ্বাসপ্রশ্বাসের ছোঁয়া—সব এক হয়ে গিয়ে তীব্র একটা অনুভূতি জাগিয়ে তুলছে। উৎকর্ণ প্রতিটি ইন্দ্রিয়।

আঃ !!

কাল যা মনে হত কদর্য কুৎসিৎ, কাল যা দেখে ঘৃণায় রী রী করে উঠত দেহমন, কালও যার সংশ্রব এড়িয়ে চলতাম সন্তর্পণে—তাই আজ মনে হচ্ছে মধুর! মধুর! মধুরতম! অনেক যত্নে গড়ে-তোলা আমার এতদিনকার আচার-আচরণের মুখোস খসে গিয়েছে, খসে পড়েছে মেকি আভিজাত্যের অহমিকা। কে চেয়েছিল আভিজাত্য? এখন মনে হয়—ওসব ভুয়ো, স-ব অর্থহীন। মিথ্যে! আমার সহজাত কামনার লক্ষ্যে পৌঁছেছি এতদিনে। জান্তব জীবনের সঙ্গে, নগণ্য মানুষের সঙ্গে, অতিসাধারণ জন-সাধারণের সঙ্গে এখন অনুভব করছি আত্মার আত্মীয়তা। এখন—জীবনে এই প্রথম। গরীবগুর্বো ওই মানুষেরা আজ অতি আপন জন আমার। শহরের এই উপকণ্ঠে, সাধারণ সৈনিক, ঝি-চাকর আর চালচুলোহীন ভবঘুরেদের মাঝখানে এসে কী স্বস্তি! বুক ভরে নিশ্বাস নিই। জনতার গায়ে গা ঘেঁষে চলে পুলকে রোমাঞ্চিত হই। আর অগাধ কৌতূহল নিয়ে প্রতীক্ষা করিঃ কোথায় গিয়ে শেষ হবে আমার এই পথচলা?

উর্স্টেল প্রেটারের কাছাকাছি পৌঁছতে ব্যাণ্ডের আওয়াজ উচ্চ থেকে উচ্চতর হল, তারই সাথে একটানা অর্কেস্ট্রা—শ্রুতিকটু পোল্‌কা আর ঝমাঝ্‌ঝম ওয়াল্‌জের আশ্চর্য সংমিশ্রণ। চারপাশের ছাউনি থেকে উঠছে হইহুল্লোড়, হাসি-উল্লাস,

মাতালের প্রলাপ। গমগম সারা তল্লাট। গাছের আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম—আলোঝলমল চারদিক, নাগড়দোলার অবিরাম আবর্তন। জীবনের এ কী উন্মুক্ত উদ্দাম প্রকাশ! নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকি, বুক ভরে শ্বাস টানি, প্রাণভরে পান করি আনন্দের এই অফুরাণ নির্যাস। নাগড়দোলায় দুলছে তরুণীরা, বাতাসে উড়ছে তাদের ঘাগড়া। দোলাটা ওপরে উঠে যায়, আতঙ্কে কলকণ্ঠে কলকল করে ওঠে সবাই। আতঙ্ক? ওই ওদের মত মেয়েদের স্বভাব! আতঙ্কের ওই মধুর অভিনয়। 'ট্রাই ইয়োর স্ট্রেন্থ'—অর্থাৎ শক্তি-যাচাইয়ের মেশিনের কাছে ভিড় করেছে কসাইদের ছেলেরা। তাদের হাসির হুল্লোড়ে কান পাতা দায়। প্রত্যেকটি ছাউনির দরজার সামনে এক-একজন দালাল দাঁড়িয়ে হনুমানের মত ভাবভঙ্গি করছে—গলা ফাটিয়ে পাল্লা দিচ্ছে যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে। জনতার অমেয় প্রাণশক্তির বহুমুখী প্রকাশে, ব্যাণ্ডের বাজনায়, আলোর রোশনাইয়ে সমস্ত এলাকাটা জীয়ন্ত হয়ে উঠেছে।

জীয়ন্ত হয়ে উঠেছি আমিও। তাই আমিও এখন নিজেকে ওদের শামিল করতে চাই, অংশীদার হতে চাই জনতাজীবনের। এই জীবনের রূপ রস গন্ধ বর্ণ অঞ্জলি ভরে পান করতে চাই। রোববারের বেপরোয়া আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে—হোক এ আনন্দ পাশবিক, তবু আন্তরিকতায় আদিম, স্বাস্থের প্রাচুর্যে টলমল। আমার মধ্যেও ওই আনন্দের সংক্রমণ ঘটছে। কামনাপীড়িত বাসনাউদ্বেল ওই নরনারীদের দেহের রোমাঞ্চশিহরণ আমিও অনুভব করছি আমার প্রতিটি

রোমকূপে। থরথর করছে আমার শিরা-উপশিরা, চড়া সুরে বাঁধা হয়ে গেছে সবকটি ইন্দ্রিয়। প্রবল খুশীর অথৈ আলোড়ন জেগেছে আমার দেহে ও মনে।

আগে কোন দিন, যতদূর মনে পড়ে, জনতার এত কাছাকাছি আমি আসি নি। এতখানি অন্তরঙ্গতা তাদের সঙ্গে আর কোন দিন বোধ করি নি। কখনো বুঝি নি যে জনতার আনন্দবন্যার দুর্বার প্রবাহ আমাকেও—আমার মত কেতাদুরস্ত মার্জিতরুচি আত্মকেন্দ্রিক অভিজাত এক ভদ্দরলোককেও—ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সমস্ত বাধা ও বাঁধ ভেঙে ভেঙে পড়ছে, অন্তর্হিত অপরিচয়ের অন্তরাল—নিখিল বিশ্বের অখণ্ড প্রাণচেতনার সঙ্গে মিশে গিয়েছে এখন আমার ব্যক্তিসত্তা। আমার আর বৃহত্তর মানবজীবনের মধ্যে এখনো যে ছোটখাট অন্তরায়গুলি রয়েছে—নিশ্চিহ্ন সেগুলিকে করতেই হবে। মানবতার এই উত্তাল সমুদ্রে নিঃশেষ আত্মালোপ চাই আমি।

বাসনাউন্মাদ পুরুষের মত এই বিশাল জনতাশরীরকে উপভোগের দুরন্ত কামনা আমায় পেয়ে বসল। নিলাজ নারীর মত আকুল হয়ে উঠলাম জনতার আদর আর সোহাগ পাবার আশায়, আশ্লেষে তার আত্মহারা হবার ব্যাকুলতায়।

এতকাল পরে আজ বুঝতে পারছি—কৈশোর থেকে যৌবনের দ্বারে পা দেবার সময় আমিও ভালোবাসতে চেয়েছি, আমিও হাহাকার করেছি ভালবাসা পাবার জন্যে। আমিও বাঁচতে চেয়েছিলাম। হাসিতে খুশীতে আবেগে কামনায় উদ্দাম ওই জনতার একজন আমিও হতে চেয়েছিলাম। আমিও! আমিও মিশে যেতে চেয়েছিলাম ওদের অস্থি-মজ্জার সাথে, একাত্ম হয়ে।

আমি কে ? এখানে কী আমার পরিচয়? নামগোত্রহীন। নগন্য ! অকিঞ্চিৎকর ! সামান্য এক মানুষ। মানুষ নই, মানুষের ভগ্নাংশ। অপরিমেয় প্রাণপুঞ্জের ছোট্ট একটি পরমাণু। অযুতের একজন।

তবু, যতক্ষণ এদের পাশে পাশে আছি, এদের সাথে মিশে রয়েছি, ভেসে চলেছি চলমান এই জীবন-প্রবাহে—আমি নগন্য নই, নিরর্থক নই। আমি ভগ্নাংশ নই, অকিঞ্চিৎকর নই। একাকীত্বের সুদূর স্বর্গে অন্তরীণ আর নই আমি।

আমি মাতাল? খেয়েছি? সন্দেহ কি! নাগড়দোলার ঘণ্টাধ্বনি, সঙ্গীতের ঝনঝনা, পুরুষসাথীদের খুনসুটিতে মেয়েদের চটুল হাসির কলরোল—আবহাওয়াকে মায়াবী করে তুলেছে। এই মায়াবী প্রভাব রক্তে আমার ঢেউ তুলছে। শিরশির করছে হাতের আঙুলগুলি, দপদপ কপালের রগ। আমি কথা বলতে চাই, আমিও কথা কয়ে উঠতে চাই। মুখ ফুটে কথা বলবার, আমার অনেকক্ষণের মৌনতাকে ভেঙে খানখান করে দেবার জোরালো একটা তাগিদ অনুভব করছি ভেতরে ভেতরে। মানুষের মিতালীর জন্যে এতখানি ব্যাকুল আর কোনদিন হই নি।

এত মানুষ আমার চারপাশে, তবু আমি ওদের কারো নই! এখনো ওদের আত্মীয় হয়ে উঠতে পারলাম না! সব থেকেও কিছু নেই আমার—সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে আকণ্ঠ পিপাসায় আমি মরে যাচ্ছি। চারদিকে জল আর জল, কিন্তু সে-জলে তৃষ্ণা মেটাবার সাধ্য কই! আমি যে ওদের থেকে আলাদা, আমি যে অন্য সমাজের অন্য জগতের জীব—সেই পার্থক্যটা ক্রমেই বেশি করে স্পষ্ট, স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

অথচ ওরা—কেউ কাউকে ওরা চেনে না হয়ত—তবু ওরা কেমন এক হয়ে গিয়েছে,—হতে পেরেছে! দেখতে না দেখতে ছেলেরা ভাব জমিয়ে ফেলছে মেয়েদের সঙ্গে, কাছে টেনে নিচ্ছে, বাহুবন্ধনে বেঁধে চলে যাচ্ছে—আমি শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। দেখছি আর ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে যাচ্ছি। পাশ দিয়ে যেতে যেতে একটি-কি-দুটি কথা, চটুল চোখের চকিত চাউনি—এই যথেষ্ট। ওইটুকুতেও পর হয়ে যায় আপন। পরস্পরের মধ্যে চেনাশোনা নেই, তবু ওরা কথা বলছে সপ্রতিভ স্বরে অন্তরঙ্গ সুরে—হয়ত এই অন্তরঙ্গতা নেহাৎই সাময়িক। হোক সাময়িক—এরি মধ্যে তো এ ওর কাছে আসছে, প্রাণ খুলে কথা কইছে, বিনিময় হচ্ছে আন্তরিকতার।

আর আমি? দূর থেকে ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে! ঈর্ষার জ্বালা বুকে নিয়ে!

কেন জাগবে না ঈর্ষা? অভিজাত সমাজের মুকুটমণি আমি, নিজের সমাজে আমার সমাদর কত! সামাজিক আদবকায়দায় সবিশেষ পারঙ্গম, বাকশিল্পী হিসেবে রীতিমত খ্যাতিমান। আর সেই আমি এখানে কিনা উপেক্ষিত? দাঁড়িয়ে রয়েছি কাপুরুষের মত? ওই যে ছোটজাতের স্বাস্থ্যবতী যুবতী স্ত্রীলোকটি চলেছে, ওর সাথে পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে কথা বলবার ভরসাটুকু পাচ্ছি নে! পাছে ও আমায় ঠাট্টা করে বসে, আর তাইতে আমার মান খোওয়া যায়! কেউ আমার দিকে তাকালেই সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে আমার চোখের পাতা। অথচ, প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলবার জন্যেও মনে আমার আকুলতার অবধি নেই।

নিজের মনের হদিশ নিজেই পাই নে। কী চাই? জানি নে। তবে এটুকু বুঝছি—অসহ্য এই নিঃসঙ্গতা। আর কিছুক্ষণ এভাবে চললে নির্ঘাৎ পাগল হয়ে যাব। হায়, তবু কেউ আমার কাছে আসে না, পাশে ডাকে না! গা ঘেঁষে চলে যায়, ভ্রূক্ষেপও করে না! বছর বারোর একটা ছেলে বারেক আমার কাছাকাছি এসে পড়ল, পরনে তার শতচ্ছিন্ন নোংরা পোশাক। ঘূর্ণায়মান কাঠের ঘোড়াগুলির দিকে লোলুপ চোখে তাকিয়ে, আলোর প্রতিফলনে ঝিক-মিক করছে মণিদুটি। মুখখানি হাঁ হয়ে গিয়েছে। ঘোড়ায় চড়ার সঙ্গতি বেচারার নেই—অগত্যা, কি আর করে, ভাগ্যবান ঘোড়সওয়ারদের হুল্লোড় দেখেই মেটাচ্ছে মনের সাধ।

তাড়াতাড়ি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। বরং বলা ভালো, জোর করে নিজেকে টেনে নিয়ে গেলাম ওর পাশটিতে। জিজ্ঞেস করলাম (কথা কইতে গিয়ে কেন থতমত খাচ্ছি? কেন নিজের স্বর নিজের কাছে বেসুরো শোনাচ্ছে?,)—'কিরে, চড়বি? ইচ্ছে করছে?'

চমকে সে ফিরে তাকাল, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল (কেন? কেন? কেন?), মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে গেল মুখখানা—উধাও হল চোখের পলকে। একটি কথাও না বলে।

আমি স্তম্ভিত। আমার কাছ থেকে ও পালিয়ে গেল! রাস্তার একটা ভিখিরি ছোঁড়াও আমার অনুগ্রহ নিতে চায় না? চায় না, না, সাহস পায় না? কেন পায় না সাহস? তবে কি আমার চেহারাতেই এমন অস্বাভাবিক কিছু রয়েছে যা দেখে লোকে ভয় পায়, যেজন্যে আমায় এড়িয়ে চলে? হয়ত।

হয়ত! হয়ত কেন, নিশ্চয়! তাই আমি জনতায় দাঁড়িয়েও ওদের একজন হয়ে উঠতে পারছি নে। তাই! তাই এই জনতার সমুদ্রে আমি আবর্জনার মত ভেসে রয়েছি, এক ফোঁটা তেলের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি—কিছুতেই মিশে যেতে পারছি নে। তেলে জলে মিশ খায় না!

তবু, হাল আমি ছাড়ব না। এই একাকীত্ব আর সইছে না। আর সওয়া যায় না! না—না—না। দামী পেটেন্ট লেদারের জুতোর মধ্যে পা দুটো যেন জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে, দামী টাইটা গলার ফাঁস হয়ে উঠেছে। অস্বস্তি—কী-যে অস্বস্তি!

ভিড়ের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারি, দূরে-দূরে কয়েক ফালি সবুজের আভাস, টেবিল-চেয়ার সাজানো। টেবিলক্লথের রঙ লাল। শস্তা চেয়ার টেবিল। দোকানদার শ্রেণীর কয়েকজন দলে দলে ভাগ হয়ে বসে বীয়ার খাচ্ছে, সিগার টানছে। আশপাশের লোকদের তুলনায় ওরা শান্ত। চারদিকে এত হইচই, খেয়াল নেই। জনতাউদ্বেল সমুদ্রে একটি দ্বীপপুঞ্জ যেন। দেখে আকর্ষণ জাগে। এগিয়ে চলি একটি দ্বীপ লক্ষ্য করে। মানুষগুলিকে দেখতে থাকি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, চোরের মত সন্তর্পণে তাকাই চারপাশ। এক টেবিলে পাঁচজন—শক্তসমর্থ এক মজুর, তার স্ত্রী, হাসিখুশী দুটি তরুণী আর ছোট্ট একটি ছেলে। সমগ্র পরিবার বোধ হয়। গানের তালে তালে মাথা নাড়ছে, সেই সঙ্গে কথা বলছে পরস্পরের সঙ্গে, হাসাহাসি করছে—চমৎকার একটি পারিবারিক আবহাওয়া গড়ে উঠেছে।

টুপি খুলে একটা চেয়ারে হাত রাখলাম, বসতে পারি কি না জানতে চাইলাম সবিনয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে দপ করে নিভে গেল তাদের মুখের হাসি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সবাই। ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে লাগল এ ওর মুখের দিকেঃ কে আগে কথা বলবে!

মা-ই আগে মুখ খুলল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

'বাঃ···নিশ্চয়···বসুন না।' অস্ফুটস্বরে বলল।

বসলাম। এবং এও বুঝলাম যে আমার উপস্থিতি ওদের মনের কপাটে কুলুপ এঁটে দিল।

টেবিলের চারিপাশে নির্বাক সবাই।

নুন আর মরিচগুড়োয় ভর্তি চেককাটা লাল টেবিল ক্লথের দিকে মাথা নিচু করে তাকিয়ে আমি, চোখ তুলে চাইতে সাহস পাচ্ছি নে। বেশ বুঝছি, ওরা আড়চোখে আমায় লক্ষ্য করছে। চোখে বিরক্তি, বিতৃষ্ণা। আর অস্বস্তি—দেহে, মনে।

হঠাৎ মনে হল (হায়, বড় দেরিতে !), সত্যিই তো, আমায় দেখে, আমার উপস্থিতিতে কেন বিরক্ত ওরা হবে না? কেন বোধ করবে না অস্বস্তি ? এই চেহারা নিয়ে এই ভাবে সেজেগুজে কেউ কখনো আসে এসব জায়গায়! নিখুঁত আমার স্যুটের কাটছাঁট, মাথায় অভিজাত বাহারী টুপী, কপোতধূসর নেকটাইয়ে মুক্তাখচিত পিন—আমার শ্বাসপ্রশ্বাসে পর্যন্ত ভুরভুর করে বেরোচ্ছে আভিজাত্যের সৌরভ। টেবিলের ওই লোকগুলির সঙ্গে আমার দুস্তর ব্যবধান গড়ে তোলার পক্ষে এই যথেষ্ট। কিছুতেই ওরা আমায় আপন বলে ভাবতে পারে না। ওদের

কাছে আমি অনাত্মীয় অবাঞ্ছিত আগন্তুক এক। তাই ওরা বিভ্রান্ত। তাই চোখে চোখে বিদ্বেষের শিখা।

পাঁচটি প্রাণীর মৌনতার চাপে চোখ তুলতে পারছি নে, পারব না কিছুতেই। উঠে চলে যাব, শক্তি নেই—সেখানেও লজ্জার বাধা।

অগত্যা বসে রইলাম, নিরুপায়। যা হয় হোক, উঠব না। দেখাই যাক—কী হয় শেষ পর্যন্ত। টেবিল-ক্লথের ঘরগুলো গুনতে শুরু করে দিলাম—বারবার।

সস্তা দামের একটা গেলাশে করে ওয়েটার বীয়ার নিয়ে এল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। এতক্ষণে যেন নড়াচড়ার শক্তি পেলাম। গেলাশে চুমুক দিতে দিতে চুরি করে দেখবার সুযোগও হল।

যা ভেবেছি, সকলের চোখ আমারি দিকে। চাউনিতে যদিও ঘৃণার ভাবটা তেমন স্পষ্ট নয়, তবে বিরক্তিও চাপা নেই। ওদের মধ্যে আমি যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছি। অবাঞ্ছিত—একেবারেই আমি অবাঞ্ছিত। শ্রেণীচেতনা দিয়ে, সহজাত বুদ্ধি দিয়েই ওরা বুঝে নিয়েছে যে আমি যা চাই নিজের সমাজে সেটা পাচ্ছি নে বলেই ওদের কাছে হাজির হয়েছি। বড়লোকের শখ! নেহাৎ স্বাদ বদলের উদ্দেশ্য। ওদের আমি ভালবাসি নে, ওদের সঙ্গ কামনা করি নে, এমন-কি এখানকার সঙ্গীতসুধা বা বীয়ার সুরার লোভেও আমি ছুটে আসি নি। বেড়াতে তো নয়ই। ওসব কারণে এখানে আসা—এহেন স্থানে আমার মত মান্যগণ্যের পদার্পণ—এক অসম্ভব অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কিম্বা, হয়ত আমার মনের হদিশ

ওরা পাচ্ছে না। আমার মত মানুষের মনের হদিশ পাওয়ার কল্পনাশক্তি ওদের নেই। না থাকুক, তবে এটা সত্যি যে, আমায় ওরা বিশ্বাস করছে না, করতে পারছে না। সেই ভিখিরি ছেলেটাও আমাকে বিশ্বাস করে নি। যেচে আমি তাকে নাগরদোলায় চড়ার সুযোগ দিতে চাইলাম, ভয় পেয়ে সে পালিয়ে গেল!

শুধু কি এরা আর সেই ভিখিরি ছেলেটাই আমায় অবিশ্বাস করছে? না, যে শত শত লোক এখানে ফুর্তির জন্যে জমায়েত—তাদের কাছেও আমি অবিশ্বাসের পাত্র। আমার চেহারা, সাজপোশাক, আমার চালচলন, এমন-কি আমার কথা বলার ধরনধারনও অপরিচিত ওদের। অতএব সন্দেহজনকও।

তবু মনে হয়, একবার যদি ওদের সঙ্গে আলাপ শুরু করতে পারি, হয়ত তাহলে ধ্বসে পড়বে এই অবিশ্বাসের দেওয়াল। কর্তা গিন্নি আমার কথায় জবাব না দিয়ে পারবে না। তরুণী তুটিও তরুণীর মত মুখ টিপে টিপে হাসবে। ছেলেটাকেও আমি কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে পারব, ওর খুশিমত শিকার-শিকার খেলা বা অন্য কিছু দেখাতে পারব। পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে হয়ে যেতে পারব ওদের আপন জন। একবার যদি—যদি একবার শুধু মন খুলে আন্তরিকতার সঙ্গে আলাপ শুরু করতে পারি! যদি একবার ওরা আমার দিকে সহৃদয় চোখে তাকায়! যদি একবার!

কিন্তু মনের কথা আমার মনেই রয়ে গেল। মুখ ফুটে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারলাম না। লজ্জায় আমি কাঠ হয়ে গিয়েছি—জানি এই লজ্জা অলীক, অর্থহীন—তবু। বসে রইলাম

অপরাধীর মত। কী ভয়ানক একটা পাপ করেছি—হায়, আমার জন্যে বেচারাদের রোববারের ছুটির সন্ধ্যেটা মাটি হয়ে গেল! গ্লানিতে মন ভরে উঠল।

দুঃসহ এই স্তব্ধতা। এই স্তব্ধতা যেন অন্তহীন। জমা।৮
এই স্তব্ধতার মুখোমুখি বসে প্রায়শ্চিত্ত করতে লাগলাম আমার অতীতের। জীবনে কতবার এই রকম পরিবেশে পড়তে হয়েছে, ভ্রূক্ষেপ না করে পাশ কাটিয়ে গিয়েছি। লক্ষ লক্ষ মানুষের সংস্পর্শে এসেছি, কিন্তু কোনও দিন কারো দিকে চোখ তুলে তাকাই নি। মুহূর্তের জন্যেও কখনো মনে হয় নি যে, হোক ওরা অতি সাধারণ নগণ্য, তবু মানুষ। নিজের কেতাদুরস্ত সংকীর্ণ সমাজটি নিয়ে মশগুল থেকেছি, বারেকের জন্যেও মনে হয় নি যে পৃথিবী অনেক বড়ো। আমার সমাজের বাইরেও রয়েছে কোটি কোটি মানুষ যাদের সঙ্গে বাঁধা আমি অদৃশ্য বন্ধনে—অদৃশ্য, কিন্তু অচ্ছেদ্য। তারাও আমার ভাই। জীবনভর অপরাধ করেছি। আজ সেজন্যে আপসোসের অন্ত নেই। ওদের সাথে আলাপ করবার বড় সাধ ছিল, চোখ তুলে তাকাবার সাধ্যটুকুও নেই!

আর তাই, আমার মত একজন মান্যগণ্য অভিজাত ভদ্রলোক মুখ বুজে মাথা নিচু করে অপরাধীর মত বসে এখন। নিরুপায় হয়ে টেবিলক্লথের চৌকো চৌকো ঘরগুলি গুনছে বার বার। ফের ওয়েটার এসে সামনে না দাঁড়ানো পর্যন্ত ঐ করেই সে সময় কাটাতে লাগল।

বীয়ারের গেলাসে দু-এক চুমুকের বেশি দিই নি, ওয়েটারকে দেখেই উঠে দাঁড়ালাম। ভদ্রতাসূচক কয়েকটি কথা বলে

বিদায় নিলাম। ওয়েটার অবিশ্যি যথারীতি সেলাম ঠুকল, কিন্তু কেমন-যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে লোকটা।

না তাকিয়েও টের পাচ্ছি আমি পিছন ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। অবাঞ্ছিত লোকটা সরে যাওয়া-মাত্র ফের শুরু হয়ে গেছে ওদের অনায়াস বিশ্রম্ভালাপ।

আবার নিজেকে সঁপে দিলাম জনতার সংবর্তে। আগের চেয়ে আকুলতর আগ্রহে, আরো বেপরোয়া হয়ে। গাছের নিবিড়কালো চন্দ্রাতপের নিচে নিচে ভিড় এখন পাতলা হয়ে এসেছে, আলোঝলমল নাগরদোলার চারপাশেও আর লোকজন নেই তেমন। কিন্তু স্কোয়ারের অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গাগুলিতে, প্রত্যেকটি কোণে কোণে আগের মতই লোকের ভিড়। আনন্দ-পিয়াসীদের খুশীর উচ্ছ্বাস থেকে থেকে ফেটে পড়ছে টুকরো টুকরো শব্দের মধ্য দিয়ে, পরমুহূর্তেই হয়ত হারিয়ে যাচ্ছে উচ্চতর ঝঙ্কারে। যেন মানুষের কণ্ঠস্বরে বাধা পেয়ে উদ্দাম হয়ে উঠেছে যন্ত্রসঙ্গীত, মানুষের কণ্ঠস্বরকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে সুরের বন্যায়, ডুবিয়ে দিতে চাইছে যন্ত্রের ঝঙ্কারে।

আর, আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে জনতার চেহারা। খেলনা-পুতুল-বেলুন হাতে ছেলেমেয়ে আর চোখে পড়ে না। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে যারা এসেছিল, তাদেরও না। এখন রয়েছে শুধু বেহদ্দ মাতালরা। শিকারসন্ধানী ভবঘুরেরা সংকীর্ণ গলিঘুঁজিতে গুটি গুটি পায়চারি করছে। আমি যখন বীয়ার খেতে গিয়েছিলাম, বীয়ারের টেবিলে যখন বসে ছিলাম পটে আঁকা ছবির মত—তখন এই আশ্চর্য জগতের ঘটে গিয়েছে অত্যাশ্চর্য এই পরিবর্তন। পরিবেশ কুৎসিৎ হয়ে উঠেছে।

হোক কুৎসিৎ, এই আমার ভালো। শ্রমজীবীদের নির্দোষ আনন্দ-উচ্ছ্বাসের চেয়ে এই আমার ভালো। কেমন একটা বিপদের ছায়া ঘনিয়ে আসছে, এই আমার ভালো। কেমন একটা অশুভ সম্ভাবনায় থম থম চারদিক, এই আমার ভালো। আশঙ্কায় মন শিহরিত, কিন্তু এর পিছনে রয়েছে আমার মনের সায়। কেননা, যে প্রবৃত্তিটা আমার মনের মধ্যে জেগে উঠেছে তার সঙ্গে এই পরিবেশের আছে অদ্ভুত এক সামঞ্জস্য। সমাজ-বিতাড়িত ওই লোকগুলির মধ্যে, ওদের সন্দেহজনক গতিবিধির মধ্যে আমি যেন নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখছি। আমারই মত ওরা যেন ঘুরঘুর করছে রোমাঞ্চের সন্ধানে। আমারই মত ওরা যেন উত্তেজনার খোরাক খুঁজছে আঁতিপাতি করে ইতস্তত। ওদের দেখে আমার ঈর্ষা হয়! ওই ছোটলোকদেরও আমি হিংসে করছি। ছাখো দেখি, কেমন বেপরোয়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর আমি! আমি দাঁড়িয়ে নাগরদোলার পাশে ঠেশ দিয়ে---এই রহস্য-নিবিড় স্তব্ধতাকে ভেঙে ফেলবার, একাকীত্বের অকথ্য যন্ত্রণা থেকে নিজেকে মুক্ত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছি, অথচ, ঠোঁটটুকু খোলবারও সাধ্য নেই, শক্তি নেই এক পা এগোবার। কাঠের পুতুলের মত আমি দাঁড়িয়ে। নির্ণিমেষে তাকিয়ে--- আলো-উজ্জ্বল এই খোলা জায়গাটার ওপাশেই সূচীভেদ্য অন্ধকার। তাকিয়ে আছি ওই অন্ধকারের দিকে, পাশ দিয়ে কেউ গেলেই চোখ ফেরাই, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে দেখি। প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠি। কিন্তু, কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকায় না! কেউ আমায় চায় না!

কে করবে আমার বন্ধনমোচন! কে দেবে আমায় মুক্তি!

কি ভাবে যে আমার মনের তখনকার কথা গুছিয়ে বলি? কি করে সেটা ব্যাখ্যা করব? সত্যি বললে, মনে হবে পাগলামি!

আমি—আমার মত একজন শিক্ষিত, বিত্তবান ও স্বাধীনচেতা মানুষ, রাজধানীর অভিজাত সমাজের এক উজ্জ্বল রতন—ওই রাতে ওই রকম জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। নাগরদোলায় ঠেশ দিয়ে পুরো একটি ঘণ্টা আমি উৎকর্ণ হয়ে ছিলাম। বিশ, তিরিশ, পঞ্চাশ,—একশবার একই ওয়াল্‌জ্, একই পোলকা সুরের একঘেয়ে পুনরুক্তি শুনছিলাম। চোখ মেলে দেখছিলাম রঙচঙে কাঠের ঘোড়াগুলির একঘেয়ে ঘূর্ণন। আর ভেতরে ভেতরে টগবগ করছিলাম অগ্নিগর্ভ উত্তেজনায়। অচিন্ত্যনীয় কোন অঘটনের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিলাম। পায়ের তলা থেকে ধীরে ধীরে মাটি সরে যাচ্ছিল।

জানি, আমার এ-আচরণ অবাস্তব। অবিশ্বাস্য। প্রায়শ্চিত্ত্যের আগুনে আমি অনির্বাণ জ্বলছি। এ প্রায়শ্চিত্ত আমার চুরির জন্যে নয়—সেই অপরাধের আগে পর্যন্ত যে অভিশপ্ত শূন্যতা আমার জীবনের টুঁটি চেপে ধরেছিল, তারই জন্যে। নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ভাগ্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়েছি—এর স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এখান থেকে আমি নড়ব না। কিছুতেই নয়।

সময় যত কাটছে, আনন্দের স্রোতে ভাঁটা পড়ে আসছে। এক-এক করে নিভে যাচ্ছে ছাউনির আলোগুলি—জোয়ারের মত এগিয়ে আসছে অন্ধকার। আলোর যে ছোট্ট দ্বীপটিতে আমি দাঁড়িয়ে, ক্রমেই তা নির্জন হয়ে উঠেছে। নির্জন, নিঃসঙ্গ।

চমকে তাকালাম ঘড়ির দিকে। আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই বন্ধ হবে রঙচঙে ওই কাঠের ঘোড়াগুলির দাপাদাপি, তাদের কপালের জ্বলন্ত লাল ও সবুজ চোখগুলি বুজে যাবে, স্তব্ধ হবে যন্ত্রসঙ্গীতের ঝঙ্কার। সব শেষ হয়ে যাবে! সব শেষ! তবু, তখনো এই অন্ধকার নির্জনে আমি পড়ে থাকব—উপেক্ষিত, পরিত্যক্ত। রাত্রির রহস্যময় মর্মর শুনব—একা।

অস্বস্তিতে কেবলি তাকাই অন্ধকার স্কোয়ারের চারপাশে—মাঝে মাঝে ঘনঘোর অন্ধকারের ছন্দ ভাঙে দু-এক জোড়া নর-নারীর দ্রুতগতি গৃহ-প্রত্যাবর্তনে। কেউ-বা চকিতে চলে যায় পাশ কাটিয়ে। তারপরেই আবার সেই অন্ধকার। স্তব্ধ, গম্ভীর, থমথমে।

কিন্তু আমার সামনে—ওই যে একটু দূরে ঘনীভূত হয়ে উঠেছে গভীর ছায়া—ওখানে কাঁপছে প্রাণের অস্থির স্পন্দন, জীবনের ইশারা। পাশ দিয়ে কোন পুরুষ গেলেই শুনতে পাই ওই ছায়ার গভীর থেকে ফিসফিস আমন্ত্রণের সংকেত। আর, সেই সংকেত শুনে যদি পথিক থেমে পড়ে, ফিরে তাকায়—স্পষ্টতর হয়ে উঠবে এক নারীর কণ্ঠস্বর। থেকে থেকে বেজে ওঠে চটুল হাসির জলতরঙ্গ। একটু একটু করে আঁধারচারিণীরা সাহসিকা হয়ে উঠছে, আলোর সীমানায় এসে পর্যন্ত হানা দিচ্ছে—ধারেকাছে পুলিশের সাড়া পেলেই উধাও আবার চোখের পলকে। পুলিশ চলে যাওয়া মাত্র ফিরে আসে ওই শিকারী ছায়ারা—এখন আরো কাছে, আরো বেপরোয়া।

মানুষের জীবন-সংগ্রামের এই হল চরম পর্যায়—স্পষ্ট সেকথা বুঝতে পারছি। একেবারে নিচুস্তরের দেহোপজীবীনী ওরা।

খদ্দের নিয়ে বসাবে, ঘর কোথায়? সামান্য কিছুর বিনিময়ে পার্কের অন্ধকার কোণে ওরা দেহের বেসাতি করে—পুলিশের দাপটে সদাসশঙ্ক, ক্ষিধের জ্বালায় সদাউদ্ব্যস্ত, নিজেদের পোষা গুণ্ডার ভয়ে সদাসন্ত্রস্ত। নিজেই ওরা সবসময় সকলের শিকার, তবু বেরোতে হয় শিকারের খোঁজে! শিকারী কুকুরের মত পার্কের আলো-আঁধারীতে পুরুষের গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়ায়ঃ দলভ্রষ্ট যদি কেউ ফিরে তাকায়, দু-এক ক্রাউনের মায়ার থেকে যদি তার কাছে বড় হয়ে ওঠে দেহের লালসা। নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে কতইবা পাবে মেয়েটি! তাই দিয়ে কিনবে এক পাত্র গরম পানীয় আর কোন কফি-স্টল থেকে ক্ষুন্নিবৃত্তির সামান্য কিছু সামগ্রী। তাই দিয়ে নিবু-নিবু জীবনশিখাটিকে কোনমতে জ্বালিয়ে রাখবে যতদিন না হাসপাতাল বা জেলের আশ্রয়ে চিরতরে সেটা নিভে যায়!

রোববারের আনন্দমদিরা এখন গেঁজে গিয়েছে, গাঁজলা উঠছে ভরভর করে। মধু পরিণত মদে, সেই মদের বুদবুদ এরা, আনন্দ-মন্থনের গরল। অন্ধকারের আড়াল থেকে একেকবার নেকড়ের মত আবির্ভূত হয়, আবাব মিলিয়ে যায় চকিতে—আতঙ্ক-বিস্ফারিত দুই চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে আমি দেখছি। এই আতঙ্কে আছে আদিম আনন্দ। এই আতঙ্কের আয়নায় প্রতি-বিম্বিত আমার অতীত। প্রথম জীবনে আমিও অতিক্রম করে এসেছি এই রকম এক বদ্ধ জলাশয়—ঝিক্‌মিকে ফসফরাসের মত সেসব দিনের স্মৃতিরা এখন জ্বল জ্বল করে উঠছে, প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে আমার নতুন করে শিহরিত করে তুলছে। মনে পড়ে দূর কৈশোরের কথা। এদের দিকে তাকিয়ে মনে সেদিন আগ্রহ

আর আশঙ্কার জোরালো একটা মিশ্র আবেগ জেগে উঠত। মনে পড়ে, একদিন একজনের পিছুও নিয়েছিলাম। তার পিছনে পিছনে স্যাঁতসেঁতে সিড়ি দিয়ে ওপরে উঠছি, ক্যাচক্যাচ করে শব্দ হচ্ছে—মনে পড়ে—সেই প্রথম। হঠাৎ চকিত বিদ্যুতের আলোয় যেন চোখের সামনে সেদিনের সেই দৃশ্যটা দেখতে পেলাম—সব, সব কিছু। শয্যার শিয়রে টাঙানো ছিল নিষ্প্রভ একটা তৈলচিত্র, মেয়েটার গলায় ছিল একটা মাদুলি—মনে পড়ে। হারানো অতীতের যেন আঘ্রাণ পাচ্ছি। একবার সেদিনের কথা ভেবে ঘৃণায় গা ঘিনঘিন করে ওঠে, পর মুহূর্তে ভরে যায় গর্বে—জীবনের যবনিকা উন্মোচনে কৈশোরের গর্ব।

আজ? আজ আমার দৃষ্টি অনেক স্বচ্ছ হয়েছে। তাই বুঝি, এই অভাগিনীদের জন্যে কেন মনটা সমবেদনায় টনটনিয়ে উঠছে। যে প্রবৃত্তি আজ অপরাহ্নে ওই দুষ্কার্যে আমায় প্ররোচিত করেছিল, সে-ই, সেই একই প্রবৃত্তি ক্ষুধাকাতর ওই পাপিয়সীদের সাথে আত্মীয়তার বাঁধনে আমায় বেঁধে দিয়েছে। চুরিকরা নোটগুলি রয়েছে পকেটবুকের মধ্যে—তার ছোঁয়ায় বুকের একটা জায়গা যেন জ্বলে যাচ্ছে। ওখানে, অন্ধকারের অন্তরালে রয়েছে কয়েকটি প্রাণী, ওরাও মানুষ। কথা কইছে ওরা ফিসফিসিয়ে, শ্বাস টানছে ওরা ভয়ে ভয়ে, সন্তর্পণে। মানুষের মুখ চেয়ে রয়েছে ওরা। হয়ত—হয়ত আমারও মুখ চেয়ে—যে-আমিও ওদের হাতে নিজেকে সঁপে দেবার প্রতীক্ষার মুহূর্ত গুণছে, সহধর্মী মানুষের সঙ্গ কামনায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে যে-আমি।

হ্যাঁ, এতক্ষণে বুঝছি, কেন লোকে এইসব মেয়ের জন্মে লালায়িত হয়। যৌনকামনার তাগিদে? সে তো ক্বচিৎ কখনো। নিছক যৌনকামনার তাগিদে নয়—নিঃসঙ্গতার দুর্বার চাপে দিশেহারা হয়ে ওদের কাছে তারা ছুটে যায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ স্বাভাবিক সম্পর্কটা ছিন্ন হয়ে গেলে সে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ওদেরই একজনকে কাছে টেনে নেয়। ওদের সাহচর্যে নতুন করে বাঁচতে চায়, বেঁচে উঠতে চায়। আজ, এই প্রথম, পরিষ্কার সেটা বুঝতে পারছি। এ-ব্যাপারে আমার শেষ অভিজ্ঞতার কথাটাও সেই সঙ্গে মনে পড়ছে—আবছা-আবছা। ইংলণ্ড—শহর ম্যাঞ্চেস্টার। অনেক যন্ত্রশহরের অন্যতম এই ম্যাঞ্চেস্টার—ইস্পাতকঠিন, প্রাণহীন। রেল লাইন গিয়েছে মাটির তলা দিয়ে, তার গর্জনে সারা শহরটা দিনরাত হাঁসফাঁস করে ধূসর আকাশের নিচে। তিন সপ্তাহ ছিলাম। আত্মীয়স্বজনের বাসায় থাকতাম। বাররূম, মিউজিক হল বা এই ধরনের কোন জায়গায় কাটাতাম প্রতিটি সন্ধ্যা। সব সময় খুঁজতাম মানুষের উষ্ণমধুর সাহচর্য। একসন্ধ্যায় এই রকম একটি মেয়ের সাক্ষাৎ পেলাম। তার অশ্লীল ইংরেজি বুকনির এক বর্ণও আমি বুঝতে পারি নি। খেয়াল হতে দেখি, আমি তার সাথে এক হয়ে গিয়েছি—অচেনা অজানা এক মুখনিঃসৃত হাসির সুধা অনায়াসে পান করে চলেছি। আমার গা ঘেঁষে রয়েছে একটি নারী-দেহ—উষ্ণ, কোমল। সেই ধূসর নিষ্প্রাণ ইস্পাতকঠিন শহরটি উধাও, যে দুঃসহ একাকীত্বের অন্ধকার আমায় ঘিরে ধরেছিল তাও। তার বদলে আমারই মত একটি মানুষ, নাম-না-জানা এক নারী এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। মানুষের প্রতীক্ষাই

ও করছিল, যে-কোন-একজন মানুষের। আমায় গ্রহণ করে সে উদ্ধার করেছে, আমাকে মুক্তি দিয়েছে একাকীত্বের অকথ্য নিষ্পেষণ থেকে। তাকে বুকে নিয়ে সেদিন বুক ভরে নিশ্বাস নিয়েছিলাম। লোহার খাঁচার জীবনেও সেদিন অনুভব করেছিলাম প্রাণের স্পর্শ। অহমের দুর্গে যারা অন্তরীণ তারাও বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পারে, তারাও কাউকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়াতে পারে—এই উপলব্ধির মূল্য তাদের কাছে অসামান্য, এ তাদের এক মস্ত বড় সান্ত্বনা। কিন্তু সেদিন একথা বুঝি নি। ওখানে—ওই অন্ধকারের মধ্যে তেমনি আরো কয়েকজন এখনো প্রতীক্ষা করছে, সামান্য কিছুর বিনিময়ে ওরা সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত। মানুষের সাহচর্যের চেয়ে মূল্যবান আর কী আছে এই বিশ্ব সংসারে! অর্থ দিয়ে সত্যিই এটা কেনা যায় না। কিন্তু ওরা—সামান্য কিছুর বিনিময়ে এই অমূল্য সম্পদ বিলিয়ে দেয় অকাতরে।

যে নাগরদোলাটি ঘেঁষে আমি দাঁড়িয়ে, তার পাশের অর্কেস্ট্রা আবার ঝনঝনিয়ে উঠল। এই শেষ বাজনা। রবিবারের পরেই আবার সেই একঘেয়ে কাজের দিনের পুনরাবৃত্তি। দৈনন্দিন কর্মের চাকায় আবার বাঁধা পড়ে যাবে মানুষেরা। শেষবারের মত এখন ঘুরবে নাগরদোলা, জ্বলবে আলোর মালা। চড়নদার আর নেই বললেই চলে। কাউণ্টারের মেয়েটি হিসেব করছে সারাদিনের টিকিট বিক্রির। বড় ক্লান্ত সে, বড় পরিশ্রান্ত! চালক দাঁড়িয়ে রয়েছে, হুক লাগান লম্বা একটা লাঠি হাতে, সময় হওয়া মাত্র থামিয়ে দেবে নাগরদোলার ঘূর্ণি।

একটা কাঠের থামে হেলান দিয়ে আমি তাকিয়ে রয়েছি জনবিরল স্কোয়ারের দিকে। সত্যিই জনবিরল, যে শিকারী

ছায়াদের কথা একটু আগেই বলেছি, তারা ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব নেই।

ওরাও প্রতীক্ষারত আমারই মত। অথচ ওদের আর আমার প্রতীক্ষার দূরতিক্রম্য ব্যবধান।

ওদের একজন অন্তত আমায় লক্ষ্য করেছিল, কেননা আড়-চোখে তাকাতে তাকাতে আমার পাশ দিয়ে সে একবার চলে গেল। মুখ নিচু করে থেকেও তার অবয়বের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি আমি দেখে নিলাম। ছোট্টখাট্ট হাড়জিড়জিড়ে রিকেটি চেহারা, মাথায় টুপি নেই, পরনে সস্তা চটকদার পোশাক, পায়ে নাচের জুতো। সবকিছুই হয়ত পুরনো পোশাকের দোকান থেকে কেনা। এর ওপর অপব্যবহারের ফলে—ওদের ব্যবসার ক্ষেত্রে যেটা অনিবার্য—আরও বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। আমার সামনা-সামনি এসে মেয়েটি বারেক থামল, চোখে-মুখে ফুটিয়ে তুলল মনমোহিনী চাউনি, ঈষৎ হাসির আমন্ত্রণ জানাল—বেরিয়ে পড়ল তার কদর্য দাঁতগুলি।

হঠাৎ আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। ভান করতে চাই ওকে দেখি নি, কিন্তু কিছুতেই ওর থেকে চোখ ফেরাতে পারি নে। সম্মোহিতের মত হয়ে গিয়েছি ঃ রক্তমাংসের একটি মানুষ আমায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছে! আমার জন্যে এক নারীর চোখে ফুটে উঠেছে অনুরাগের আলো। একী বিস্ময়! ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে আমি অবসান ঘটাতে পারি আমার ঘৃণ্য একাকীত্বের। একটি-কি-দুটি কথা বলে, কিম্বা চোখের নির্বাক ইশারায় নিজের মুক্তি অর্জন করতে পারি। একঘরে মানুষের মত যে তীব্র অন্ত-র্দাহে জ্বলে জ্বলে খাক হচ্ছি—এক্ষুনি তার শেষ হয়ে যেতে পারে।

তবু, মুখ ফুটে একটি শব্দও আমি উচ্চারণ করতে পারলাম না। কোনও রকম চোখের ইসারা করতেও না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিলাম তেমনি দাঁড়িয়ে রইলাম। কাঠের থামটির পাশে, কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ।

তবু, একটা তৃপ্তি বোধ করছি। সমাপ্তির মুখে যন্ত্রসঙ্গীতের বাজনাটা একঘেয়ে হয়ে উঠেছে, আমার ক্লীব মনেও জ্বলে উঠেছে খুশীর শিখা—সবার সামনে দাঁড়িয়ে এক নারী অনুরাগ-ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকাল আমার দিকে! বার বার তাই মনে পড়ছে। আমারই মত একজন মানুষ আমায় ডাকছে, চুম্বকের মত সে আমায় আকর্ষণ করছে!—চোখ বুজে অনাস্বাদিত-পূর্ব আনন্দের এই অনুভূতিটা আমি উপভোগ করতে লাগলাম। চোখ বুজে!

নাগরদোলার ঘূর্ণি থামল। থেমে গেল যন্ত্রসঙ্গীত। চোখ মেলে তাকালাম—মেয়েটি দূরে সরে যাচ্ছে। বুঝেছে, একটা কাঠের পুতুলের পিছনে ঘুরে মরা নিরর্থক। স্বভাবতই সে আমার উপর বীতস্পৃহ হয়ে পড়েছে।

তাকে চলে যেতে দেখে হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম, সর্বাঙ্গ হিম হয়ে এল। হায়! হায়! কেন ওকে আমি যেতে দিলাম? কেন ওকে আমি ছেড়ে দিলাম? আজকের এই মায়াবী রাতে একজন অন্তত আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, অনুরাগভরা চোখে তাকিয়েছিল, আমায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিল—কেন আমি তাকে যেতে দিলাম অবলীলায়!

আমার পিছনে আলোগুলি একে একে নিভিয়ে দেওয়া হল। দোর-ঝাঁপ বন্ধ করা হচ্ছে। উৎসব শেষ আজকের।

হঠাৎ—কী যে হচ্ছে আমার ভেতরে কি করে তা বোঝাব! —হঠাৎ আমার মনের মধ্যে জেগে উঠল ব্যাকুল একটা বাসনা: হাড়জিড়জিড়ে নোংরা কুৎসিৎ ওই গণিকাটি আর একবার শুধু মুখ ফিরিয়ে তাকাক, শুধু আর একবার—যাতে ওর সাথে আমি কথা কইতে পারি! না, ওকে অনুসরণ করতে আর আমার অহমিকায় (ধুলোয় মিশে গেছে আমার অহমিকা! তার জায়গায় জেগে উঠেছে আরেকটি নতুন অনুভূতি) বাধবে না। কিন্তু অনুসরণ করার শক্তি নেই যে! ভেতরে ভেতরে বড়-বেশি অস্থির হয়ে পড়েছি। ব্যাকুল প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম—মেয়েটা যদি বারেক ফিরে তাকায়। যদি দয়া করে চোখের ভাষায় আর-একবার আমন্ত্রণ জানায়!

এবং, ফিরে সে তাকালও। প্রায় যান্ত্রিকভাবে কাঁধের ওপর দিয়ে চকিত চাউনি হানল একবার। আমি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। আমার মনের ভাবটা চোখেমুখে স্পষ্ট ফুটে উঠে থাকবে কেননা সঙ্গে সঙ্গে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমায় লক্ষ্য করতে লাগল আড়চোখে। তারপর একটুখানি কাৎ হয়ে মাথা নেড়ে ইশারা জানাল—ইশারায় দেখিয়ে দিল স্কোয়ারের অন্ধকার কোণটা।

এদিকে আমার শরীরেও যেন এতক্ষণে শক্তি ফিরে আসছে। যে অশরীরী বাঁধনে বাঁধা পড়ে গিয়েছিলাম, ধীরে ধীরে সেই বন্ধন খসে পড়ছে।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম।

স্বাক্ষরিত হয়ে গেল অদৃশ্য সেই চুক্তি।

আবছা-আবছা আলোয় ও এগিয়ে চলেছে, থেকে থেকে

পিছন ফিরে চাইছে—দেখছে যথারীতি ওর অনুসরণ আমি করছি কিনা।

হ্যাঁ, আমি অনুসরণ করছি সম্মোহিতের মত। কে যেন আমায় টেনে নিয়ে চলেছে।

দুটি চালাঘরের মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ গলি-পথ, তার কাছাকাছি এসে ও চলার গতি শ্লথ করে দিল। আমি এসে ওকে ধরে ফেললাম।

মেয়েটা আমার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, বেশ কিছুক্ষণ ধরে—চোখে ফুটে উঠেছে সন্দেহের ছায়া। আমার ভীরু মার্জিত চালচলন আর চেহারার সঙ্গে এই পরিবেশের গরমিল ওকে সন্দিহান করে তুলেছে। কিন্তু নিতান্তই সাময়িক এই দ্বিধা। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে আলকাতরার মত অন্ধকার গলিটির দিকে ইশারা করল। বলল, 'চলুন ওই সার্কাসের পেছনে, ও জায়গাটা খুব নিরিবিলি আর অন্ধকার।'

জবাব দিতে পারলাম না। ব্যাপারটার স্থূলতায় আমি বোবা হয়ে গিয়েছি। ইচ্ছে হল, দুটো ক্রাউন ছুঁড়ে দিয়ে এই মুহূর্তে মুক্তি কিনে নিই, মাপ চেয়ে রেহাই পাই। কিন্তু ইচ্ছে অনুযায়ী কাজ করবার শক্তি তখন আমার ছিল না। টোবগ্যানের উপর যেন বসে রয়েছি, বরফের উপর দিয়ে হু হু করে নেমে চলেছে গাড়িটা, সামনেই ভয়াবহ একটা বাঁক, একটু উনিশ-বিশ হলে আর রক্ষে নেই—বুঝছি, বুঝে আতঙ্ক জাগছে, কিন্তু সে আতঙ্ককে ছাপিয়ে উঠছে আনন্দ। বরফের উপর টোবগ্যানের প্রচণ্ড গতিবেগ থেকে জন্ম এই আনন্দের। হিতাহিত

জ্ঞানশূন্য আমি এই আনন্দে। গাড়ির গতি রোধ করার বদলে তাই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতে সঁপে দিচ্ছি নিজেকে। আত্মসম্বরণ করতে পারলাম না।

হয়ত-বা করতেই চাইলাম না। ও যখন আমার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল, আপনা থেকেই ওর হাতখানা জড়িয়ে ধরলাম। শীর্ণ-বিশীর্ণ—কোন নারীর অঙ্গ বলে মনে হয় না, এ যেন অপরিণত এক কিশোরীর কৃশ বাহু। হাতটা মুঠো করে ধরে সমবেদনায় মন ভরে গেল। আহা বেচারা! আজকের এই আশ্চর্য রাত এ কাকে এনে আমার চলার পথে দাঁড় করাল! অপমানিত অধঃপতিত মনুষ্যত্বের অতি নগণ্য ক্ষুদ্র এই ভগ্নাংশের দিকে তাকিয়ে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল।

ম্লান-আলোকিত গলিপথটুকু পেরিয়ে এসে ঝোপের মধ্যে আমরা ঢুকে পড়লাম। কী-এক অশুভ সৌরভে চারপাশের অন্ধকার থমথম করছে। ওপরে গাছপালার আচ্ছাদন। লক্ষ্য করলাম, এখানে ঢোকার সময় মেয়েটা একবার ফিরে তাকাল, কয়েক পা গিয়ে ফের আবার। তিমিরাভিসারের পথে পা বাড়ানোর সাথে সাথে দেহের দিক দিয়ে আমি যেন পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হয়ে পড়েছি, অনুভূতি কিন্তু আগের মতই প্রখর। দেখলাম দূরে একটি ছায়া আমাদের পিছু নিয়েছে, তার সন্তর্পণ পদধ্বনি কানে আসছে।

চকিতে ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। আমায় প্রলোভন দেখিয়ে ঝোপঝাড়ে নিয়ে যাওয়া হবে, তারপর এই মেয়ে আর তার পোষা গুণ্ডাটা বাগে পেয়ে আমায় চেপে ধরবে। তাদের মুঠোয় আমি চলে যাব।

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে মানুষের অন্তর্দৃষ্টি এক-একসময় অদ্ভুত-ভাবে খুলে যায়। ভবিষ্যৎটা যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, চোখের সামনে। এখনও সময় আছে, এখনও আমি পালিয়ে যেতে পারি। বড় রাস্তার কাছাকাছি এসে পড়েছি, ট্রামগাড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। একবার যদি চিৎকার করে উঠি, দেখতে দেখতে লোকজন ছুটে আসবে।

আত্মরক্ষার কত রকম উপায় রয়েছে, মনে মনে ভাবতে লাগলাম। মনে মনে তার মহড়া দিয়ে চললাম।

কিন্তু, কী আশ্চর্য! আসন্ন বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আতঙ্কে হাত-পা সিঁটিয়ে আসা দূরে থাক, দুর্বোধ্য খুশীতে শরীর শিউরে শিউরে উঠছে যে!

আজ, এতদিন পরে, আমার তখনকার আচার-আচরণের যুক্তিযুক্ততা নিরূপণ আমার পক্ষে অসম্ভব। অসম্ভব আমার সেই মানসিকতার বিশ্লেষণ। এমন-কি, সামনের দিকে এগোতে এগোতেও আমি স্পষ্ট বুঝছিলাম যে সাধ করে শয়তানের ফাঁদে পা দিচ্ছি, স্বেচ্ছায় নিজের মরণ ডেকে আনছি—কিন্তু তবু এর মধ্যে রয়েছে রোমাঞ্চ। আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই রোমাঞ্চ!

হয়ত একটা কেলেঙ্কারী হবে, ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াবে তার পরিণাম। যে-ব্যাপারে আমি জড়িয়ে পড়ছি, ভেবে দেখলে সেটা রীতিমত হুঙ্কারজনক। কিন্তু, আমার তখন নেশা ধরে গিয়েছে, মৃত্যুর আশঙ্কাও আমার কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কেন, কিসের টানে আমি এগিয়ে চলেছি? নিজের ভীরুতার পরিচয় দিতে লজ্জিত বলে? নাকি পালাবার শক্তি আমার নেই? তা নয়। বরং মনে

হয়—জীবনের তলানিটুকুর স্বাদ নেবার জন্যে আমি উন্মুখ হয়ে উঠেছি, তাই আমার সমগ্র অস্তিত্বকে বাজি রাখতে চাইছি এক দানে। এক্ষুনি হেস্ত-নেস্ত একটা করতেই হবে। তাই আসন্ন ও অনিবার্য বিপদ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন থেকেও ঝোপেঝাড়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চললাম। কোন রকম দৈহিক আকর্ষণ মেয়েটির মধ্যে নেই, তবু ওকে বাহুবন্ধনে বেঁধে রাখলাম। ও আমাকে ওদের শিকার বলে ধরে নিয়েছে টের পেয়েও ওকে সোহাগভরে জড়িয়ে রইলাম। রেসকোর্সে সেই অপকীর্তির মধ্য দিয়ে যে-খেলা আজ শুরু করেছি, তার জের আমাকে টানতেই হবে, শেষ পর্যন্ত সেই খেলা খেলে যেতেই হবে। মৃত্যুও যদি হয় এই খেলা-শেষের যবনিকা—তবু থামা চলবে না, থামলে চলবে না।

কয়েক পা গিয়ে মেয়েটা আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকাল পিছনে ফিরে।

'কত দেবেন বলুন তো ?'

ও, তাইত—এটার কথা আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। দরাদরিও যে এসব ব্যাপারের দস্তুর !

ওর কথায় আমি বিব্রত হলাম না। কেন হব—ওকে সর্বস্ব উজাড় করে দিতে পারলে আমি বর্তে যাই। এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে রূপোর মুদ্রা যতগুলি ছিল, সব ওর প্রসারিত করতলে ঢেলে দিলাম। সেই সঙ্গে তিনটি দোমড়ানো নোটও।

এই সময় এমন একটা অঘটন ঘটে গেল যে ভাবলে আজো আমার বুকের রক্ত ছলকে ওঠে। আমার দিলদরিয়া ভাব দেখে মেয়েটা বোধ হয় তাজ্জব হয়ে গিয়েছে, আমার কৃপণ-সুলভ

চালচলনের সঙ্গে এটার কোন সামঞ্জস্য খুঁজে না পেয়ে বিস্ময়ে হতভম্ব। এক পা পিছিয়ে দাঁড়াল। অশুভ-সৌরভ মেশানো সেই ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যেও আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম---বিস্ময়ে কৌতূহলে বিস্ফারিত ওর চোখ দুটি অপলক তাকিয়ে রয়েছে আমারি দিকে।

আর এতক্ষণে—সারাটা সন্ধ্যা ধরে যার জন্যে হাহাকার করে ফিরেছি---এতক্ষণে যেন আমি তারি নাগাল পেলাম। স্বতন্ত্র একটি মানুষ হিসেবে আমার দিকে একজন চোখ তুলে তাকাল, একজন অন্তত স্বীকার করে নিল আমার মানবিক অস্তিত্ব। এখানে, এই আরেক জগতে, একটি মানুষের চোখে আমি রক্ত-মাংসের জীয়ন্ত মানুষ হয়ে উঠলাম। জীবনে এই প্রথম।

একথা সত্যি যে, দুর্ভাগাদের মধ্যেও দুর্ভাগাতম এই নারী—অন্ধকারের নির্জনে নিজের জীর্ণ দেহটিকে এ পণ্য করে ঘুরে বেড়ায়, পছন্দ-অপছন্দ দূরের কথা, খদ্দেরের মুখের দিকেও বারেক তাকিয়ে দেখবার অবসরও হয় না—আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে দুই চোখে জিজ্ঞাসার শিখা জ্বেলে এই প্রথম। এ-ই প্রথম আমাকে বুঝতে চাইছে, জানতে চাইছে কোন্ ধরনের আজব আশ্চর্য এক মানুষ আমি। তাই না বিচিত্র একটা উল্লাসের অলোড়ন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছে আমার মধ্যে!

ও আরও-একটু গা ঘেঁষে এল। দাম দিয়ে ওকে কিনেছি বলে পেশাদারী কর্তব্যের তাগিদে নয়, মনে হয়, কৃতজ্ঞতার প্রেরণায়। এই কৃতজ্ঞতাবোধ সম্পর্কে নিজেই হয়ত অচেতন, তবু আমার গা ঘেঁষে এল, আমাকে সোহাগ জানাতে চাইল—

পুরুষকে সোহাগ জানাবার সহজাত মেয়েলি সাধটা অভাগীর মনে বোধ হয় জেগেছে

আবার আমি ওর শীর্ণ বাহুটি জড়িয়ে ধরলাম, আবার আমি অনুভব করলাম ওর হাড়জিরজিরে বিশীর্ণ দেহটির স্পর্শ। ভাববার চেষ্টা করলাম—কি করে মেয়েটি জীবন কাটায়, কি ভাবে ওর দিন চলে! মনের পটে ভেসে উঠল, দীনদরিদ্র এক বস্তির ছবি —দারিদ্র্যজীর্ণ প্রায়ান্ধকার একটি স্যাঁতসেঁতে কুঠুরী। বস্তিতে সব সময় ঝগড়াঝাটি লেগে রয়েছে, সেই সাথে ছেলে-মেয়েদের হইহুল্লোড়—তারই মাঝে সকাল-সন্ধ্যে একটু গড়িয়ে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে মেয়েটা। সকাল থেকে সন্ধ্যে—এইটুকু তার অবসর। দুদণ্ড চোখ না বুজলে কি করে চলবে! গুণ্ডা-বদমাইসদের মুখ চেয়ে দিন কাটে আশঙ্কায়। যত মাতাল আর লম্পট ওর নিয়মিত খদ্দের—চোখের সামনে যেন হুবহু দেখতে পাচ্ছি। তারপর? তারপর হাসপাতালে বন্দিনী। অথবা অনাথ আশ্রমের নরকে অন্তিম নিশ্বাস! অপরিসীম সমবেদনায় মনটা মোচড় দিয়ে উঠে, আত্মসম্বরণ করতে পারি নে, একটু ঝুঁকে পড়ে ওকে চুমো খেলাম। বিস্ময়ে ও বিমূঢ় হয়ে গেল।

হঠাৎ পেছনে পদশব্দ। একটা শুকনো ডাল মড়মড় শব্দে ভেঙ্গে পড়ল। সশব্দে কে যেন কর্কশ হাসি হেসে উঠল। ধ্বনিত হল মানুষের কণ্ঠস্বর।

'এইবার চাঁদ—একেবারে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছি।'

ফিরে না তাকিয়েই বুঝলাম, ওরা কারা। প্রথম থেকেই আমার পিছু নিয়েছে আমি জানি, প্রতি মুহূর্তে ওদেরই

প্রতীক্ষা করছিলাম—কখন, কতক্ষণে এসে ওরা ধরে ফেলবে আমায়।

প্রথমে একটি মানুষের চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠল, তার পিছনে আর একটির। তুই গুণ্ডা। বিজয়গর্বে হাসছে।

'এখেনে ওসব বদমাইসি হচ্ছে—অ্যাঁ! ওরে! বাস্‌রে, ইনি আবার দেখছি ভদ্দরলোক! দাঁড়াও বাছাধন, তোমার ভদ্দর-লোকগিরি আজ বার করছি।'

আমি দাঁড়িয়ে—অনড়, অচল। চুপচাপ। কপালের রগ-গুলো দপ্‌দপিয়ে উঠছে, উঠুক—না, মনে কোন রকম আশঙ্কা জাগে নি। আমি শুধু দেখতে চাই কোথায় এর শেষ। ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করে রইলাম, শান্তভাবে। এই রকম একটি চরম পরিণতির প্রতীক্ষাই তো করছি আজ সন্ধ্যা থেকে।

মেয়েটা আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে, তবে লোক তুটোর সাথে গিয়ে যোগ দেয় নি, দাঁড়িয়ে রয়েছে একটু তফাতে। ওর ভূমিকাটা একটু অস্বস্তিকর বইকি!

আমার নিস্পৃহ নির্বিকার ভাব দেখে স্বভাবতই লোক তুটো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে, এর ওর দিকে তাকাচ্ছে ফ্যালফ্যালিয়ে—আশ্চর্য! ব্যাটা ভয় পায় না কেন? কেন আমাদের হাতে পায়ে ধরে রেহাই চায় না!

শেষপর্যন্ত জলদগম্ভীর স্বরে একজন বলল, 'এ যে স্রেফ বোবা মেরে গেল র্যা!'

দ্বিতীয় জন আমার সামনে এসে দাঁড়াল। হুকুমের সুরে বলল, 'চলো মোসাই, থানায় যেতে হবে!'

কোন জবাব দিলাম না।

সামনের লোকটা আমার কাঁধে আস্তে এক রদ্দা মারল।

'চলো!'

চললাম। ওদের নির্দেশ মত। বাধা দেবার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করলাম না। কেননা ভালোভাবেই জানি যে পুলিশের ভয় আমার চেয়ে ওদের বেশি অনেকগুণ, এবং কয়েক ক্রাউনের বিনিময়ে অনায়াসেই আমি রেহাই পেতে পারি এই মূহূর্তে। কিন্তু না, রেহাই পেতে আমি চাই নে—পরিস্থিতির এই ভয়ঙ্কর বিদ্রূপটাকে আমি রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করব। ওরা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। ধীরে ধীরে, দম দেওয়া পুতুলের মত, আমি ওদের অনুসরণ করছি। আমার ব্যবহারে ওরা পড়ে গিয়েছে মহা মুশকিলে। অত সহজেই আমি থানায় যেতে রাজী হয়ে যাব, স্বপ্নেও ভাবে নি।

আমায় নিয়ে এখন করে কি ওরা! ইঙ্গিতে-ইশারায় নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করল। তারপর আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে একজন বলল, 'ছেড়ে দে শালাকে, বুঝলি।' লোকটার সারা মুখে বসন্তের দাগ।

'না না না—খেপেছিস!' দ্বিতীয়জনের নীতিবোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, 'আমাদের মতন হাঘরেদের ওপর তো পুলিশ খুব রোয়াব ঝাড়ে। এইটুকুন ইদিক-উদিক হলে আর রক্ষে নেই—থাকো শালা হাজতে বন্ধ হয়ে!···এমন একটা চোস্ত ভদ্দরলোককে হাতে-নাতে ধরেও ছেড়ে দেব—বলিস কি রে।'

কথাবার্তার ধরনে বেশ বুঝতে পারছি—টোপ ফেলছে। মুক্তির জন্যে এবার আমারই উদ্যোগী হয়ে দরাদরি শুরু করা কর্তব্য। আমার মধ্যে যে অপরাধীটা লুকিয়ে রয়েছে সে ঠিক

চিনে নিয়েছে তার তুই সমধর্মাকে। জান, আমায় ভয় দেখাতে গিয়ে আমার মতিগতি দেখে নিজেরাই ওরা এখন বেকুব বনে গেছে। আমার সঙ্গে ওদের এখন মৌন প্রতিদ্বন্দ্বিতা—নিঃশব্দ লড়াই শুরু হয়েছে।

কী মহিমাময় এই মৌন প্রতিদ্বন্দ্বিতা!

অন্ধকার নরকে, তুই গুণ্ডা আর এক গণিকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে, প্রত্যাসন্ন বিপদের মুখোমুখি হয়েও আবার আমি অনুভব করছি দৈবের মায়াবী শিহরণ—বারো ঘণ্টার মধ্যে এই দ্বিতীয়বার। দ্বিতীয়বার, কিন্তু এবার আমি বাজি রেখেছি আগের চেয়ে অনেক-বেশি মূল্যবান একটি জিনিস—জীবন। এবার আমার জীবন পণ। নিঃশেষে নিজেকে সঁপে দিয়েছি এই জুয়ার হাতে, জানি নে কোথায় এর শেষ। জানতে চাই নে।

'অই, অই হোথায় পুলিশ দাঁড়িয়ে।' একজন বলে উঠল, 'এবার বাবু মোসায় মজা বুঝবে'খন। কম-সে-কম এক হপ্তা শ্রীঘরবাস—হুঁ বাব্‌বা!'

আমাকে ভয় দেখাতে চাইছে। কিন্তু কথা বলতে গিয়ে ওর নিজেরই গলার স্বর জড়িয়ে আসে কেন?

বুক ফুলিয়ে আমি আলোটার দিকে এগিয়ে চললাম। সত্যি আলোর নিচে একটি পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। আলো পড়ে ঝকমক করছে তার শিরস্ত্রাণ। আর খানিকটা গেলেই ওর কাছে আমরা পৌঁছে যাব।

লোক তুটো আমার পিছনে পিছনে আসছে। ওদের কথা যেন সব ফুরিয়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে ঢিলে দিয়েছে চলায়। এবং একটু পরেই টুক করে সরে পড়বে অন্ধকারে—তাও

আমি জানি। পালাবে, ফিরে যাবে ওদের নিজেদের জগতে। হতাশার জ্বালায় ক্ষেপে উঠবে,—হয়ত গায়ের ঝাল ঝাড়বে ওই বেশ্যাটার—অভাগিনী ওই মেয়েটির ওপর।

তবে কি শেষ হয়ে গেল খেলা! তবে কি আমিই, আবার আমিই জিতে গেলাম! দু-দুবার জয়ী হলাম একই দিনে!

আলোটা চক্রাকারে রাস্তার ওপরে পড়েছে, তার কাছাকাছি পৌঁছাবার আগে একবার ফিরে তাকালাম। এই প্রথম মুখোমুখি চেয়ে দেখলাম লোক দুটোকে। বিরক্তি আর আত্মগ্লানিতে বিমর্ষ দু জোড়া চোখ। ভীত, সন্ত্রস্ত। তৈরী হয়ে আছে চকিতে উধাও হবার জন্যে। ওদের ক্ষমতা শেষ, আর ওদের করণীয় কিছু নেই। ঘুরে গেছে খেলার মোড়—আমাকে দেখেই এখন ওরা আতঙ্কিত।

সমবেদনায় বুক ভরে গেল, লোক দুটির দিকে তাকিয়ে জেগে উঠল অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্ববোধ। ক্ষুধার্ত ওই মানুষ দুটো আমার কাছে এমন কীই বা চেয়েছিল? সমাজের এক পরগাছা আমি। অপরিমিত পানভোজনে আমি দিন যাপন করি। সেই আমির কাছে কী অন্যায় দাবি ওরা করেছিল? সামান্য দুই-একটি ক্রাউন মাত্র! ইচ্ছে করলে অন্ধকার ঝোপের মধ্যে ওরা আমার গলা টিপে ধরতে পারত। ইচ্ছে করলে আমার সর্বস্ব ছিনিয়ে নিতে পারত। ইচ্ছে করলে খুন পর্যন্ত আমায় করতে পারত! সেসব কিছুই করে নি, শুধু গতানুগতিক প্রথায় ভয় দেখাতে চেয়েছে। শুধু ভয় দেখিয়ে কিছু আদায় করে নিতে চেয়েছে।

ওরা বদমাইস, নিঃসন্দেহে, ওরা শয়তান—কিন্তু আমিই-বা কোন্ সাহসে ওদের মনে ব্যথা দিই—যে আমির নিছক একটা

খেয়াল মেটাতে চুরি করতে বাধে না, যে আমির রোমাঞ্চের আস্বাদ-লালসায় গুরুতর অপরাধ করতে আটকায় না? এ অন্যায়, ভয়ানক অন্যায়! বরং ওদের ভয় দেখিয়েছি বলে আমার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। এখনো সময় আছে—ওদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি, কিন্তু এখনো সময় আছে—এখনো, এই শেষ মুহূর্তেও ওদের হতাশার দাম আমি শোধ করে দিতে পারি। দেব, তাই দেব। আহারে! ছাখ দেখি বেচারাদের চোখের চাউনি কেমন করুণ হয়ে এসেছে।

হঠাৎ চলার গতি থামিয়ে হনহন করে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম ওদের একজনের সামনে। জোর করে উৎকণ্ঠার ভাব ফুটিয়ে তুললাম কণ্ঠস্বরে।

'আঁ! তোমরা—তোমরা কি সত্যিসত্যিই আমায় পুলিশে ধরিয়ে দেবে নাকি? না না, দোহাই তোমাদের! বলো, কী চাও? কেন তোমরা আমায় পুলিশে দেবে? হয়ত আমার কদিনের জেল হবে, কিম্বা কিছুই হয়তো হবে না—কিন্তু তোমাদের তাতে কি লাভ বলো? মিছিমিছি কেন আমার ক্ষতি করবে।'

লোকদুটো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ঠিক এর জন্যে ওরা প্রস্তুত ছিল না। ভেবেছিল আমিই উল্টে ওদের ধরিয়ে দেবার হুমকি দেব, কুকুরের মত ল্যাজ গুটিয়ে পালাবার তখন পথ পাবে না। একেবারে শেষ সময়ে আমি যে এভাবে ভেঙে পড়ব, সরাসরি আত্মসমর্পণ করে বসব—ওরা ভাবতেও পারে নি। তাই বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে। কি করবে না করবে ঠাওর করে উঠতে পারছে না।

অবশেষে একজন, ভয় দেখাবার সুরে নয় অনেকটা আত্মগতভাবে, বলল, 'আমরা তার কি করব! আইনে যা আছে হবেই। আমরা সেরেফ ডিউটি করছি—কি বল্‌রে, অ্যাঁ?'

মুখস্থ বুকনি। এ সব ক্ষেত্রে বলার জন্যে আগে থেকেই মহড়া দিয়ে রাখা। তবু বড় নির্জীব শোনাল লোকটার কণ্ঠস্বর। দুজনের একজনও চোখ তুলে আমার দিকে তাকাতে পারছে না। প্রতীক্ষা করছে। জানি, কিসের প্রতীক্ষা। ওরা চায়, আমি ওদের কাছে দয়া ভিক্ষে করি, নগদ মূল্যে দয়া কিনে নিই।

সমগ্র দৃশ্যটা আজও মনে আছে, আমার সে-অনুভূতির প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি এখনো স্মরণে আনতে পারি। মনে পড়ছে—প্রথমে আমার মনে প্রবল একটা ঈর্ষা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। ইচ্ছে হয়েছিল, আরো কিছুক্ষণ অনিশ্চিত আশঙ্কার মধ্যে রেখে ওদের উদ্বেগ অস্তিত্বটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করি। কিন্তু তা আমি করি নি, নিজের বদবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিই নি। আর ওদের দুঃখ দিতে মন চাইছিল না। ওদের উৎকণ্ঠিত করে রাখার বদলে আমি শুধু করে চলেছিলাম আতঙ্কের অভিনয়ঃ দোহাই! দয়া করে ওরা যেন আমায় পুলিশে না দেয়। সে কী কাকুতি মিনতি আমার! দেখলাম, এরকম ব্ল্যাকমেলিংয়ের ব্যাপারে লোকদুটোও তেমন পোক্ত হয়ে ওঠে নি—আমার ব্যবহারে রীতিমত হকচকিয়ে গেছে। অবশেষে আমি উচ্চারণ করলাম সেই কথাগুলি, যার জন্যে ওরা লোলুপ হয়ে উঠেছিলঃ

'আমি·······আমি তোমাদের একশ ক্রাউন দেব! দয়া করে আমায় ছেড়ে দাও।'

শুনে তিনজনেই চমকে উঠল, একসঙ্গে। বিমূঢ়দৃষ্টিতে এ ওর দিকে তাকাতে লাগল। তীরে এসে তরী ডোবার মুখে এতখানি প্রত্যাশা ওরা কেউ করে নি। হাল তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল, এমন সময় কিনা—একশো ক্রাউন!

অবিশ্যি বসন্তের দাগওয়ালা লোকটি অভ্যেস মাফিক আরেকটু মোচড় দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু বেশ কিছুটা কসরতের পর তার গলা থেকে শুধু বেরোল, 'দয়া করে ওকে দুশো করে দেন, হুজুর!'

'থাম্।' হঠাৎ ধমকে উঠল মেয়েটি, 'দুশো করে দেন হুজুর! উনি যদি এক আধলা দেন তো বাপের ভাগ্যি মনে করবি! বাবু আমায় ছোঁনও নি। বেশি বাড়াবাড়ি ভালো নয়, বুঝলি।'

মেয়েটি ক্ষেপে গিয়েছে। আর, তার দিকে তাকিয়ে অন্তরে আমার বেজে উঠল খুশীর রাগিনী: একজন আমায় সহানুভূতি জানাল! একজন আমার হয়ে কথা কইল! নির্লজ্জ এক গণিকা, গুণ্ডা দুটোর সঙ্গে ওরও রয়েছে যোগসাজস, তবু ওর অন্তরাত্মা এখন ন্যায়বিচারের দাবি তুলেছে। বলকারক ওষুধের মত আমার মনে ওটা প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করল। আমিও আর ওদের খেলাতে পারছিলাম না, ওদের লজ্জা ও আতঙ্ক আর আমি সইতে পারছিলাম না।

এখনকার এই মুহূর্তে, এই মায়াবী মুহূর্তে, ওদের সঙ্গে আমি গড়ে তুলেছি অত্যাশ্চর্য এক মানবিক সম্পর্ক। চুরি-করা তাড়া থেকে দুখানা নোট বার করে কাছের লোকটার হাতে গুঁজে দিলাম।

সে শুধু বলল, ঠিক যে ইচ্ছে করে তা নয়, আপনা

থেকেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ,' বলেই পিছন ফিরল।

ধন্যবাদ! আমায় ব্ল্যাকমেল করতে এসেছিল, যাবার সময় সবিনয়ে জানাল ধন্যবাদ! ব্যাপারটার অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে ও নিজেও সচেতন। সেজন্যে ওরও লজ্জার অবধি নেই। আর, ওর এই লজ্জার জন্যে আমার মনস্তাপের। আমার সামনে ও লজ্জাবোধ করুক, এ আমি কখনো চাই নি। চাইতে পারি নে। আমরা যে একই পালকের পাখি! ও চোর, চোর আমিও। আমিও কাপুরুষ, মেরুদণ্ডহীন—ওরই মত! ওর আত্মগ্লানিতে আমি যেন মরমে মরে গেলাম। ওর আত্মমর্যাদা ফিরিয়ে আনবার জন্যে উদ্যোগী হয়ে উঠলাম। সরাসরি অস্বীকার করে বসলাম ওর ধন্যবাদ গ্রহণ করতে।

'আমায় তুমি ধন্যবাদ দিচ্ছ কি, আমারই বরং তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।' সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বললাম, 'সত্যিই ধরিয়ে দিলে আমার কী সর্বনাশটা হত ভাবো দেখি! জন্মে কারো কাছে মুখ দেখাতে পারতাম! নির্ঘাৎ আমায় আত্ম-ঘাতী হতে হত। আমি আত্মঘাতী হতাম, অথচ তোমাদেরও কিছু লাভ হত না। তার চেয়ে এই কেমন ভালো হল বলতো। যাকগে আমি এখন ডান দিকে যাব, তোমরা বোধ হয় ওদিকে যাবে, না? আচ্ছা চলি তাহলে—নমস্কার।'

মুহূর্তখানেক ইতস্তত করে প্রথমে এক জন বলল, 'নমস্কার', তারপর দ্বিতীয়জন, সব শেষে মেয়েটি—ওদের আড়াল থেকে। অতি আপনজনদের কাছ থেকে যেন বিদায় নিলাম। কী আন্তরিকতা ওদের কণ্ঠস্বরে! শুনে মনে হল—ওদের মনে আমি

দাগ রাখতে পেরেছি। আমার কথা, আজ রাতের এই ঘটনাটার স্মৃতি কোনদিন ওরা ভুলবে না। হাসপাতালের দিনগুলিতে একথা ওদের মনে পড়বে, মনে পড়বে কারাগারের অন্ধকার নরকে। ওদের সর্বরিক্ত জীবনে এ এক মহামূল্যবান অক্ষয় স্মৃতি হয়ে বিরাজ করবে। আমার আমিত্বের ক্ষুদ্র একটা ভগ্নাংশ আজ ওদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গেল, আজীবন সেটা বেঁচে থাকবে আমার স্মারক হিসেবে। ওদের আমি কিছু দিতে পেরেছি। দানের এই আনন্দ আমার মনে অনাস্বাদিত-পূর্ব তীব্র একটা অনুভূতি জাগিয়ে তুলল।

স্কোয়ার থেকে বেরোবার গেটের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললাম। নির্জন চারপাশ। মনে আর বিন্দুমাত্র অবসাদ নেই। চারপাশের গাছেরা যেন ফিসফিস স্বরে আমার সাথে আলাপ করছে—বড় ভালো লাগছে! উপরে আমার অগণন নক্ষত্ররাজি—তাদের আলোর অভিনন্দনে আমি আনন্দিত। আমি আনন্দিত! দূরে দূরে কারা গানের সুরে কথা কইছে—গান গাইছে ওরা আমারি জন্যে। সবকিছুই এখন আমার—আমার—আমার। অহমের খোলস ভেঙে আমি বেরিয়ে এসেছি, দীর্ঘদিনের বহু-আকাঙ্ক্ষিত মুক্তিকে আজ অর্জন করেছি। দানের আনন্দ, অমিতব্যয়িতার আনন্দ আমার সঙ্গে আজ বিশ্বমানবের মিলনের রাখি বেঁধে দিয়েছে। 'কত সহজ', মনে মনে বললাম, 'কত সহজ পরকে আনন্দ দেওয়া, আর আনন্দ আহরণ করা! আনন্দিত হওয়া কত সহজ! কৃত্রিম বিভেদ-বাঁধের মুখটা শুধু খুলে দাও, হু হু করে আসবে আনন্দের উদ্দামস্রোত—জীবনানন্দের বন্যা। উঁচু-নিচুর সমস্ত অন্তরায়কে নিশ্চিহ্ন করে প্রত্যেকটি

মানুষকে সে একসূত্রে গেঁথে দেবে—বর্তমানের জন্যে, ভবিষ্যতের জন্যে, আবহমান কালের জন্যে। সমগ্র মানবজাতি পরিণত হবে অবিভাজ্য এক সত্তায়।'

গেটের কাছে পৌঁছতেই নজরে পড়ল, ঘোড়ার গাড়ির আস্তাবলটার কাছে একটি বুড়ি বসে রয়েছে। ফেরিওয়ালী। পণ্যদ্রব্যের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। বড় ক্লান্ত, বড় বিষণ্ণ তার বসার ভঙ্গিটি। সামগ্রী বলতে কয়েকটি ছাতাপড়া বাসি কেক, আর শুকনো ফল গুটিকয়। সেই সকাল থেকে, সন্দেহ নেই, এই ভাবে বুড়ি বসে আছে সামান্য কিছু রোজগারের আশায়। নিছক গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনে।

'তুমিও কেন আমার মত জীবনকে উপভোগ করবে না?' মনে মনে বললাম, এগিয়ে গেলাম। একটা কেক কিনে বাড়িয়ে দিলাম একখানা নোট। ভাঙানির কথা ভেবে নোটটা নিতে বুড়ি থতমত খাচ্ছিল, হাতের ইশারায় জানিয়ে দিলাম, চাইনে ভাঙানি।

আনন্দে, বিস্ময়ে বুড়ির সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগল, দুহাত তুলে আমায় আশীর্বাদ করল; মুখ অনর্গল—কী বলে যে আমায় কৃতজ্ঞতা জানবে!

সেদিকে কান না দিয়ে আমি এগোলাম। গাড়িতে জোড়া অবস্থায় একটা ঘোড়া ঘাড় গুঁজে ঝিমুচ্ছিল, কেকটা তার মুখের কাছে ধরলাম। সে ঘর্‌ঘর্‌ শব্দ করে উঠল, ও-ও যেন আমাকে ধন্যবাদ দিতে চায়। ও-ও আমায় বন্ধু বলে গ্রহণ করেছে।

আনন্দ চাই, আরো আনন্দ। ক্রমেই আমার মনে আনন্দের জন্যে প্রবল একটা আকুলতা জেগে উঠছে। জানতে হবে,

পরিপূর্ণ ভাবে আমায় জানতে হবে, কয়েকটি রূপোর মুদ্রা বা ছাপানো দু'চারটে রঙিন কাগজের বিনিময়ে কত সহজে সমস্ত অবসাদকে ঝেড়ে ফেলা যায়, কত আনায়াসে মনকে আনন্দিত করে তোলা যায়। কেন ধারেকাছে কোন ভিখিরি দেখছি নে? শুভ্রকেশ এক বৃদ্ধ সুতোবাঁধা অনেকগুলো বেলুন হাতে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে—কেন কোন ছেলে মেয়েকে আশেপাশে দেখতে পাচ্ছি নে! একটি বেলুন হাতে পেলে যারা স্বর্গ সুখ পায়, এখন তারা কোথায়? আহা! দেখেই বোঝা যায় দিনটা বুড়োর আজ বড় খারাপ গিয়েছে—বিক্রিবাটা বোধহয় একদম হয় নি।

'সব বেলুনগুলা আমাকে দাও—কিনব।'

'এক-এক পেনি দাম পড়বে কিন্তুক।' বুড়ো সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল, আমার মত ধোপদুরস্ত এক ভদ্দরলোক এই মাঝরাত্তিরে সত্যি সত্যি ওর ওই রঙচঙে বেলুনের জন্যে লালায়িত হয়ে উঠেছে, ব্যাপারটা ও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

'বেশ তো! তাই দেব—দাও।' বলে দশক্রাউনের একটা নোট ওকে দিয়ে দিলাম।

বিস্ময়ে ও থরথরিয়ে উঠল। সম্মোহিতের মত সুতোটা আমার হাতে সঁপে দিল।

আঙুলে সুতোর টান লাগছে—একসাথে বাঁধা বেলুনগুলি শূন্যে উড়ছে, আকাশে উড়ে যেতে চাইছে, অধীর হয়ে উঠেছে মুক্তির পিপাসায়। ওরাই বা কেন মুক্তি পাবে না? সুতো ছেড়ে দিলাম, বেলুনগুলি শূন্যে উঠে যেতে লাগল। বেলুন তো নয়, নানারঙের কয়েকটি চাঁদ যেন। হইচই করে চার পাশ থেকে

লোকজন ছুটে এল। খলখল করে হাসছে সবাই, হাসতে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছে।

এক জোড়া প্রেমিক প্রেমিকা, বোধ হয় অন্ধকারে মগ্ন ছিল নিরিবিলি বিশ্রম্ভালাপে, তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়াল। রাস্তায় কোচোয়ানরা খুশীতে উত্তেজনায় ঘন ঘন চাবুক কষাচ্ছে হাওয়ায়, চিৎকার করে এ ওকে ডেকে দৃশ্যটা দেখাচ্ছে—গাছের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে বেলুনগুলো, ভেসে চলেছে বড়িঘরের ওপর দিয়ে। আমার কৌতুকে সকলেই আনন্দিত। আনন্দিত!

হায়! কেন আমি আগে এটা জানতাম না। পরকে আনন্দিত করার মধ্যে যে এতখানি আনন্দ থাকতে পারে কেন তার পরিচয় আমি আগে পাই নি।

হাতের মুঠোয় নোট ভর্তি ব্যাগ—তালুটা তাই যেন জ্বালা জ্বালা করছে। বেলুনের সুতো ধরে আঙুলে যেমন টান লেগে-ছিল, তেমনি একটা শিহরণ, তেমনি একটা অস্বস্তি বোধ করছি তালুতে। এই নোটেরাও ওইভাবে উড়ে যেতে চায়—অনির্দেশ যাত্রায়।

নোটগুলো বের করে নিলাম। শুধু ল্যাজোসের কাছ থেকে চুরি-করা নোটগুলি নয়, আমার নিজের গুলিও। কেন না, আমার কাছে ওই দুইয়ের মধ্যে কোন তফাৎ এখন নেই। সব একাকার আমার কাছে—যে কেউ চাইবে তারই কাছে যাবার জন্যে উদগ্রীব। চারদিকে তাকালাম, নির্জন পথ। শুধু একটা ধাঙড় রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছে। নিজের দেহের ভারও যেন বেচারা বইতে পারছে না—এমনই ক্লান্ত-করুণ তার চলা-ফেরার ধরন। দাঁড়ালাম তার কাছে গিয়ে।

লোকটা ভাবল, ওকে হয়ত আমি সামনে থেকে হটে যাবার হুকুম করব। বিরক্ত হয়ে তাকাল—দুই ভুরু কুঁচকে। কিছু না বলে কুড়ি ক্রাউনের একখানা নোট ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। প্রথমে ও থতমত খেয়ে সরে গেল। হাত পেতে নিল নোটখানা। নির্বাক জিজ্ঞাসায় জানতে চাইল তার কাছে আমি কী চাই?

'এ-দিয়ে তোমার খুশিমত যা হয় কিনো।' বলে আমি চলে এলাম।

রাস্তা দিয়ে হাঁটি, আর উঁকিঝুঁকি মারি ইতস্তত। যদি কেউ আমার কাছ থেকে কোন উপকার চায়।

নিজে থেকে কেউ যখন এগিয়ে এল না, অগত্যা আমাকেই উদ্যোগী হতে হল। এক দেহপসারিণী মুখোমুখি এসে পড়েছিল, তার হাতে একটা নোট গুঁজে দিলাম। এক আলোওয়ালাকে দিলাম দুখানা। পথপাশের একটা রুটির দোকানের জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিলাম একখানা। এইভাবে আমি এগিয়ে চললাম সামনের দিকে—পিছনের পথে বিস্ময়ের আর কৃতজ্ঞতার আর আনন্দের স্মরণচিহ্ন রেখে রেখে।

শেষ পর্যন্ত নোটগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলাম। ইতস্তত, এখানে-ওখানে সবখানে। রাস্তায়, গীর্জার সিঁড়িতে। ঐ সিঁড়িতে বসে এক বুড়ি রোজ আপেল বিক্রি করে। কাল সকালে সে যখন একশ ক্রাউনের একখানা নোট পাবে—কেমন হবে তার মনের অবস্থা? এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের জন্যে সে বিধাতার পায়ে শতকোটি প্রণাম জানাবে। রাস্তার নোট-গুলো হয়ত কুড়িয়ে পাবে কোন দুঃস্থ ছাত্র কিম্বা বাড়ির দাসী,

কি বেকার শ্রমিক। সেই একই বিস্ময় জেগে উঠবে তাদেরও মনে, একই আনন্দ—যে বিস্ময় আর আনন্দের প্রেরণায় নোটগুলি আমি দু হাতে এখন ছড়িয়ে ফেলছি চারপাশে।

শেষ নোটখানার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে অনেকখানি হালকা মনে হল। আমিও এখন উড়ে যেতে পারি। অভিনব একটা স্বাধীনতার আস্বাদ পাচ্ছি—জীবনে এই প্রথম। ওই যে উদার আকাশ, দূরপ্রসারিত ওই যে পথ, সার সার বাড়ি—সব কিছুর সঙ্গে আমার গড়ে উঠছে নতুন করে আত্মীয়তার সম্পর্ক। আজ পর্যন্ত কোনদিনও বাস্তব পরিবেশের প্রাণসত্তাকে এমন প্রবলভাবে উপলব্ধি করতে পারি নি। আমার সমগ্র অস্তিত্বের চরমতম মুহূর্তেও বারেকের তরে মনে হয় নি যে ওদেরও জীবন রয়েছে। মনে হয় নি, একই জীবনধারা বয়ে চলেছে ওদের আর আমার মধ্যে। এ সেই মহিমময় জীবন, ইন্দ্রিয়াসক্তির পথে যার নাগাল পাওয়া যায় না—ভালোবেসে আর ভালোবাসা দিয়ে যাকে চিনতে হয়।

আরো-একবার পুরনো অস্বস্তিটা জেগে উঠেছিল—সেই শেষবার। বাড়িতে এসে পৌঁছলাম, সদরের তালা খুলে তাকালাম ভেতরের দিকে—অন্ধকার বারান্দাটুকু পেরিয়ে ঘরে যেতে হবে। সেই সময় হঠাৎ মনে হয়েছিল, ঘর তো নয়, ও আমার পুরনো জীবনের বন্দিশালা—মনে হতেই অস্বাভাবিক আতঙ্কে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। আবার সেই পুরনো জীবন, পুরনো পরিবেশ? আবার সেই অতিপরিচিত ঘর আর বহুপরিচিত শয্যার আশ্রয়? আবার সেই শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি—গতানুগতিক পুনরাবৃত্তি? আজ রাতে যার

কলুষকঠিন বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে আনলাম, আবার তাকে বরণ করে নিতে হবে!

না। অতীতের আমিতে আর আমি ফিরে যাব না। কালও আমি যে-ভদ্রতার মুখোস মুখে এঁটে ছিলাম, সেটা আজ ছিঁড়ে ফেলেছি, ছুঁড়ে ফেলেছি। আর তা তুলে আমি নেব না। অভিজাত সমাজের আদবকায়দার দাসানুদাস হয়ে আমি আর চলব না। আর আমি পৃথিবীর দিকে মুখ ফিরিয়ে অহমের দুর্গে অন্তরীণ থাকব না। না। না। না। তার চেয়ে বরং পাপ করব, অপরাধ করব—ভয়ানক দুষ্কার্যের নেশায় মেতে উঠব! যে কদিন বাঁচি সত্যিকারের রক্তমাংসের মানুষ হয়ে বাঁচব।

ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে, তবু ঘুমোবার সাহস পাচ্ছি নে —পাছে ঘুমের প্রলেপে নবজীবনের সদ্যলব্ধ অনুভূতিটা মুছে যায় মন থেকে। পাছে ঘুম ভেঙে মনে হয়—এ সব মিথ্যে, স-ব অলীক, কল্পনা। আজকের ওই অভিজ্ঞতা ক্ষণস্থায়ী এক স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু পরদিন যখন ঘুম ভাঙল, দেখলাম, মনটা আগের মতই প্রফুল্ল রয়েছে। নতুন অনুভূতির স্রোতস্বিনী তেমনি প্রবল বেগে প্রবহমান।

তারপর সুদীর্ঘ চারিটি মাস কেটে গিয়েছে—কিন্তু সেই পুরনো অবসাদ আর ফিরে আসে নি। প্রথম যেদিন আমি গতানুগতিক জীবনের পথ পরিহার করে না-জানার অভিসারে বেরিয়ে পড়েছিলাম, বেগের আবেগে আর আনন্দের মদে মাতাল হয়ে নিজেকে অতলান্ত জীবনের হাতে সঁপে দিয়েছিলাম, সেটা স্মরণীয়তম দিন, আমার জীবন-নাটকের ক্লাইম্যাক্স। ক্লাইম্যাক্সের

উত্তেজনা-শিহরণ এখন অবিশ্যি নেই, তবু উজ্জীবনের আনন্দ-আস্বাদ থেকে আজো আমি বঞ্চিত হই নি। আমার নবজন্ম হয়েছে, আমি জানি, আমার জীবনায়ন ঘটেছে। আমি এখন নতুন নতুন ইন্দ্রিয়ের অধিকারী, আমার আনন্দ আহরণের ক্ষেত্র এখন বহুধা-বিস্তৃত, আমার জাগ্রত চেতনা এখন জীবনের অঙ্গীকারে সোচ্চার। আমি কি আগের চেয়ে উন্নততর মানুষ হয়ে উঠেছি? জানি নে। এটা বিচার করে দেখবার সাহস পাই নে। তবে এটুকু জানি যে আগের চেয়ে এখন আমি অনেক বেশি খুশী। জীবন আমার কাছে নিষ্প্রাণ নিরর্থক হয়ে পড়েছিল, কিন্তু আজ সে নতুন প্রাণ নতুন মানে খুঁজে পেয়েছে।

কোন্ নামে একে চিহ্নিত করব? 'জীবন!' শুধুই 'জীবন'—এ-ছাড়া কোন সংজ্ঞা এর নেই। সমস্ত কৃত্রিম বাধানিষেধের জঞ্জাল দুহাতে সরিয়ে আজ আমি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছি। যে-সামাজিক বৈষম্য আমার চারপাশে এতকাল বিভেদের বৃত্ত টেনে রেখেছিল, এখন তা নিশ্চিহ্ন। মানুষের বা নিজের মুখোমুখি হতে আর আমি লজ্জা পাই নে। সম্মান, মানমর্যাদা, অপরাধ, পাপ ইত্যাদি গুরুগম্ভীর শব্দগুলি আজ আমার কাছে অর্থহীন, শূন্যগর্ভ। ওগুলো ব্যবহার করতেও এখন ঘৃণা হয়। সেই মায়াবী রাতে যে অদৃশ্য শক্তি আমি আবিষ্কার করেছিলাম, তারই প্রাণপ্রেরণায় আমার এই মানসিক রূপান্তর। জানি নে, এ আমাকে কোন পথে নিয়ে যাবে। হয়ত আমাকে নামিয়ে ফেলবে আরেক জগতে—লোকে যাকে বলে পাপ আর অপরাধের জগৎ। কিংবা পৌঁছে দেবে কোন মহান লক্ষ্যে, জীবনোত্তর জীবনে আমার উত্তরণ ঘটবে। কি হবে জানি নে, জানতে চাইও

নে। কারণ, আজ আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি—সেই সত্যি করে বাঁচে, ভবিষ্যতের রহস্য উন্মোচনের দুরাশায় যে কখনো উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে না। বর্তমানকে নিয়েই যে সুখী, সন্তুষ্ট।

তবে একটি বিষয় সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ—জীবনকে এমনভাবে ভালো আর কোনদিন বাসি নি। এবং এই জীবন—জীবনের যে-কোন দিক, যে-কোন প্রকাশ সম্পর্কে নিরাসক্ত থাকা অপরাধ (জীবনে অপরাধ বলতে তো শুধু এই একটাই রয়েছে!)। নিজেকে বুঝতে পারার সাথে সাথে আমার চারপাশের চলমান জীবনকেও আজ আমি স্পষ্টতরভাবে উপলব্ধি করতে পারছি। বিপণির বাতায়ন পথে কারো লোলুপ দৃষ্টি চোখে পড়লে মন এখন আমার চঞ্চল হয়ে ওঠে, কুকুরের আনন্দনৃত্যে খুশীর ঝলক জাগে। সব কিছুর প্রতিই আজ আমি কৌতূহলী, কোন ব্যাপারেই আর নির্বিকার নই।

আগে খবরের কাগজের পাতায় ভালো করে তাকাতামও না, এখন ছোট-বড় প্রত্যেকটি খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ি। কী উৎসাহ সে-পড়ায়! আগে যে সব বই পড়ে বিরক্ত হতাম, আজ তাতে পাই অঢেল উত্তেজনা। আর, সব চেয়ে আশ্চর্য হল, অভিজাত সমাজে যাকে বলা হয় 'আলাপচারি'—সেই মাপা-জোকা-হিসেব-করা বিদগ্ধ বাক্যালাপের পরোয়া না করে আমি এখন সকলের সঙ্গেই যা-ইচ্ছে-তাই নিয়ে অনায়াসে আলোচনা করে যেতে পারি, লজ্জায় মাথা কাটা যায় না। আমার চাকরটা সাত বছর ধরে আমার কাছে রয়েছে, এতদিন তাকে দেখেও দেখতাম না—আজ তার সম্পর্কেও আমার কত কৌতূহল। প্রায়ই ওর সঙ্গে বসে গল্প-গুজব করি। বাড়ির দারোয়ান—

কতদিন দরজায় ওকে দেখেছি, ভ্রূক্ষেপ করি নি,—কাল আমায় বলল, তার ছোট মেয়েটি মারা গিয়েছে। শুনে এমন অভিভূত হয়ে পড়লাম, কী বলব! শেক্সপীয়রের কোন ট্রাজেডিও এতখানি অভিভূত আমায় করতে পারে নি।

অবিশ্যি, বাইরে থেকে দেখলে আমি সেই পুরনো আভিজাত্যের আওতাতেই রয়ে গেছি মনে হতে পারে, কিন্তু আমার ভেতরের পরিবর্তনটা, সন্দেহ কি, সকলেই টের পেয়ে গেছে। আগের চেয়ে লোকে এখন অনেক আন্তরিকভাবে আমাকে অভিবাদন জানায়। গত সপ্তাহে তিন তিনবার রাস্তায় একটা কুকুর আমায় তাড়া করছিল। এমন স্নেহ-কোমল দৃষ্টিতে বন্ধুরা আজকাল তাকায়—যেন দীর্ঘদিনের রোগ ভোগের পর সবে সেরে উঠেছি। বলে, দিনকে দিন আমার বয়েস নাকি কমে যাচ্ছে!

সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি বয়েস আমার কমে গিয়েছে? জানি নে। তবে এটুকু জানি—নতুন করে আমি বাঁচতে শুরু করেছি। হ্যাঁ, আমিও জানি যে মানুষের মতিবিভ্রম ঘটে। সংসারী লোকেরা মনে করে তাদের অতীত শুধু ভুলে আর ভ্রান্তিতে ভরা—তাও আমি জানি। এবং এও জানি—অবশেষে আমি সত্যি সত্যিই বেঁচে উঠলাম—আমার এই উদ্ধত ঘোষণা, জড় কাগজের ওপর জড় লেখনী দিয়ে প্রাণচঞ্চল হাতে এই কথাগুলি লিখে যাওয়া—অহমিকার পরিচায়ক। কিন্তু, তবু, যদি আমার বিভ্রমও ঘটে থাকে, তবে এই বিভ্রমের যাদু ছোঁয়াতেই জীবনে প্রথম আমি আনন্দিত হয়েছি। সেই বিভ্রমই প্রথম আমার রক্তে আলোড়ন এনেছে, আমার চেতনাকে অর্গল-মুক্ত

করে দিয়েছে। আমার এই নব-জাগরণের চিত্র যদি এখানে এঁকে থাকি, তা এঁকেছি শুধু নিজেরই জন্যে। অবিশ্যি আমি জানি যে শুধু আখর সাজিয়ে সাজিয়ে সেই চিত্রকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলা যায় না।

এ নিয়ে কোন বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করি নি। ওরা তো জানত না যে মানসিক মৃত্যুর অতলে আমি তলিয়ে গিয়েছিলাম। তাই ওরা কল্পনাও করতে পারবে না জীবন আমার কেমন ভাবে এখন ফের মঞ্জুরিত হয়ে উঠেছে! জানি, আমার এই জীয়ন্ত জীবনের ওপর অকস্মাৎ মৃত্যুর যবনিকা নেমে আসতে পারে—কিন্তু তা ভেবে আমি একটুও বিচলিত নই। আমার এ-লেখা আর কারো চোখে পড়তে পারে ভেবেও না। যে অভিজ্ঞতার কথা আমি লিপিবদ্ধ করলাম অমন অভিজ্ঞতা যাঁর জীবনে ঘটে নি, অমন মায়াবী পরিবেশের মুখোমুখি যিনি কখনো হন নি—আমার এ লেখা পড়ে তিনি বুঝবেন না। যেমন ছ মাস আগে আমিও বুঝতাম না—যদি না সেই অপরূপ অপরাহ্ন আর মায়াবী সন্ধ্যার অচিরস্থায়ী, প্রায়-অলৌকিক ঘটনাবলীর স্পর্শে আমার চেতনার দীপশিখা জ্বলে উঠত। ও ধরনের পাঠকের কথা ভেবে আমি লজ্জিত নই। নিজেকে যে একবার চিনতে পেরেছে, এ জীবনে তার কিছু হারাবার নেই। নিজের সত্তাকে যে উপলব্ধি করতে পেরেছে, বিশ্বমানবের প্রাণসত্তার পরিচয়ও তার জানা হয়ে গিয়েছে—জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।